আকাশ আসবে নেমে

শামসুর রাহমান

কাব্যগ্রন্থ(১৯৯৪)

অগ্নিপথ

নদীর ঝাপ্টায় চমকে উঠে তাকাই, উপকূলের ঘুম
সত্তা ছেড়ে মেঘমালায় লীনঃ কয়েকটি
পাখি চঞ্চুতে রৌদ্রের অকপট
সততা নিয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ করে, ওদের ডানায়
ঢেউয়ের স্বরগ্রাম, চোখে ভবিষ্যতের
নীলকান্ত মণির বিচ্ছুরণ, বন্ধুরা কোথায়? আমারতো
একসঙ্গে স্তব্ধতাকে গান উপহার দিয়ে
বেরিয়ে পড়েছিলাম পর্যটনে।
ডাঙায় নৌযানের টুকরো টাকরা এক
বিপর্যয়ের মূক কথক; দূর দিগন্তের গা ধুইয়ে
উতরোল জলরাশি; সারা শরীরে মাঝ গাঙের
জলজ ঘ্রাণ, মৎস্যঘ্রাণ নিয়ে
অবসাদের বালির চিকচিকে শয্যায়
শুয়ে আছি, সহযাত্রীরা কোন অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে
হিংস্র অতীতের দখলে? পাখির চিৎকারে

চিন্তা তরঙ্গে নেমে আসে আর্তনাদ ছেড়ে যাওয়ার
পরের স্তব্ধতা। গা ঝাড়া দিই
জলচর পাখির মতো। আমাকে ফিরে যেতে হবে
অনেক আগেকার বিস্ফোরণের বলয়ে,
এক অগ্নিপথ থেকে অন্য অগ্নিপথে
যেতে হবে হেঁটে। সেখানে এই বিড়ম্বিত ব-দ্বীপের
ইতিহাস রাজহাঁসের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়ানো।

অব্যক্ত থেকে যায়

আমার চোখে এত পানি নেই যে,
এই দুরন্ত আগুন আমি নেভাতে পারি;
আমার লেখার টেবিলে এত জায়গা নেই যে,
নরখাদক-তাড়িত শত মানুষকে দেবো ঠাঁই।
যে শব্দগুলো আমার দিকে আসছিল
প্রজাপতির মতো উড়ে,
সাঁতার কেটে মাছের মতো, তারার স্রোতের মতো,
মৌমাছির মতো, ওরা ভীষণ পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।
শব্দের শ্মশানে দাঁড়িয়ে, চিত্রকল্পের গোরস্তানে বসে
আমি কেবল ছাই ওড়াই, ছিঁড়ি ঘাস।
আমার শব্দগুলোর গলায় জল্লাদ
বেধড়ক ছুরি চালায়; ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে
উপমার বুক থেকে। আমার শব্দাবলী
খোলা আকাশের নিচে একবস্ত্রে হি হি কাঁপছে
উপকূল-ঘেঁষা ঘরপোড়া মানুষের মতো শীতের

দাঁত বসানো রাতে প্রাণভয়ে।
এ কোথায় বাস করছে আমার শব্দেরা?
ওদের মাথার খুলিতে দুঃস্বপ্ন ঠাসা,
ওদের চেতনা সারাক্ষণ অপঘাত-শানিত
ওদের চোখে ভেসে ওঠে বারবার ক্রুশকাঠ এবং
ওরা চোখ খুলতে ভয় পায়, পাছে দেখে ফেলে
নিরপরাধ লাশ, ধর্ষিতা নারীর উলঙ্গ শরীর।
আমার শব্দাবলী জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে,
ক্ষুধার্ত আর ভোজতৃপ্তদের মাঝখানে,
ভোর ও সন্ধ্যার মাঝখানে,
হত্যাযজ্ঞের উন্মত্ত উল্লাস আর
শান্তি মিছিলের মাঝখানে স্তম্ভিত,
চোখ রগড়ায়, শান্তির গান গাইতে গিয়ে
দাঙ্গাবাজদের পায়ের তলায় পড়ে
অব্যক্ত থেকে যায় সময়হীনতায়

অভিলাষ

লোকটা ক্ষয়েছে খুব, বেশিদিন বাঁচবে না আর,
বড় জোর টিকে যাবে দু'তিন বছর। ঘুণ ধরা
ফুসফুস নিয়ে পথ হাঁটে, পুরনো কালের ঘড়া,
মেঘের, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে এবং পাহাড়
সহজে ডিঙিয়ে যায়, নদী পার হয়, দীর্ঘ রাত
জেগে পদ্য লেখে ভাবে কাগজের বুকে হীরে
জ্বলজ্বল করে; লোকে তাকে উপেক্ষার রুক্ষ তীরে

ঠেলে দেয়, কাটে তাকে বার বার কষ্টের করাত।
ভীষণ কেউটে তার নিকটেই থাকে, তোলে ফণা,
খেলা করে বৃক্ষতলে, নদীতীরে। ব্যাপক মড়ক
চেটে নেয় খর জিভে মেধা ও মনন, ওড়ে ছাই
সভ্যতার; খৃষ্টের মাথার জ্যোর্তিমণ্ডলের কণা
মর্চে-পড়া, লোকটা নিভৃতে বলে, 'হে দীপ্র হীরক,
ও বৃক্ষ ও নারী আমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চাই'।

অসুখ

অসুখ আগেও ছিল, কিন্তু আজকাল কষ্ট হয়
খুব, নষ্ট হয় ক্ষয়া শরীরের স্থিতিস্থাপকতা
প্রায়শই। বৃদ্ধ কবিরাজ আয়ুর্বেদীয় ধারায়
ওষুধ দিলেন, যাতে ফুসফুস থাকে ঠিকঠাক।
কৌটো যত্নহীন এক কোণে পুরু ধুলোময়তায়
ঝিমায়, কবিতা আসে অমাবস্যার রাতে, শুষে নেয়
মেদমজ্জা, গড়ে থাকি অবসন্ন; অক্ষয়ের দ্যুতি
পূর্বস্মৃতি হঠাৎ জাগিয়ে তোলে, বাড়ে অসুস্থতা।
নিজের কবিতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়ার সাধ আজ
স্তিমিত, এমনকি বন্ধুর কাছেও পদ্য টদ্য
এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা বনবাসে গেছে। যতদিন
আয়ু জ্বলে ধিকি ধিকি, ততদিন অন্তরালে বসে
কবিতার মুখ দেখে নিতে চাই গোধূলি বেলায়,
মধ্যরাতে, সভা সমিতিতে গরহাজির থাকব।
খারাপ ভাবছ বুঝি? এখন কী করি আর? এই

অসুখের ধরণই এমন, করে কর্তব্যবিমুখ।

আকাশ আসবে নেমে

বিচলিত হয়ো না এখন, স্থির হও সমুদ্রতলের
মতো, ধাক্কা খাবে, খেতে হবে বহুদিন, ভেঙচি
কেটে চলে যাবে বহু লোক, কেউ কেউ
হানবে আঘাত, সয়ে যাও সবকিছু ধৈর্য ধরে।
তোমার হৃৎপিণ্ড ঠুকরে ঠুকরে খাবে বিমাল শকুন,
খেতে দাও; এরকমই হয় চিরদিন,
পাথরে থাকবে বন্দি তুমি বহুকাল। কেননা তোমার কাছে
মুক্তিবাণী আছে, বয়ে যাও যন্ত্রণার শুরুভার হে নীরবে।
দেবতারা খুব ঈর্ষাকাতর তোমার সাহসের
দীপ্তি দেখে, তোমাকে পোড়ায় তাই উহাদের ক্রোধ।
এভাবে পুড়তে হবে দিনরত্রি, জ্যোৎস্নার প্রলেপ
সহজে পাবে না তুমি মরবার আগে।
বিচলিত হয়ো না এখন, গলা ছেড়ে গাও গান
প্রহরের প্রহরে, পাখি আর লতাপাতা কীট পতঙ্গ শুনুক
কী অমর্ত্য সুর বাজে মর্ত্যবাসীর গলায় দেবনায়;
আকাশ আসবে নেবে শৃংখলিত দু'পায়ে তোমার।

আমন্ত্রণ

তোমাকে একবার এখানে ডেকে নিয়ে

আসতে চাই এ গাছপালার
ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে রাখা বাড়িটার
কাছে। ভেতরে যাবার দরকার নেই হে হাওয়া,
এই লতাপাতার ঘ্রাণ
পাখির গান, তোমার
কেমন লাগবে, জানি না।
খনিক এগিয়ে
গাছের ডাল সরিয়ে একটু ঝুঁকে
যদি দাঁড়াও, কলিং বেল বাজাতে চাও,
তোমার কাঁধে এসে
বসবে ফুরফুরে এক প্রজাপতি,
কিছু মনে করো না।
হাওয়া,
লতাপাতার সবুজ ঘ্রাণ,
নৈঃশব্দ্যের তান, বাড়ির দীর্ঘশ্বাস।
বাড়ির ভেতরে দ্রষ্টব্য
এই আর কি
ভেতরে নানা বয়েসী
ক'জন মানুষের বসবাস,
বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি
থাকেন চুপচাপ, মাঝে-মধ্যে দু'বছরের
এক শিশু, তাকে জড়িয়ে ধরে
পেছন থেকে, তিনি মৃদু হেসে
কিছুক্ষণ খেলা করেন ওর সঙ্গে। তারপর
তার কলম কাগজে সাজায় অক্ষরমালা।
ভেতরে যাওয়ার কী দরকার?

কী প্রয়োজন ওর নৈঃসঙ্গ্যের মুহূর্তগুলোকে
কাচের গুঁড়ো করে দেওয়ার?
তিনি টেবিলে ঝুঁকে লিখুন,
তাঁকে লিখতে দাও।
নিজের দ্রুত কমে-যাওয়া সময়কে
তিনি শাসন করছেন
শব্দের হিরন্ময় চাবুকে।
হাওয়ায় উড়ুক ওর শাদা চুল,
তেজী ঘোড়ার মতো
চলুক ওর কলম। একদিন
তিনি এ বাড়িতে হবেন গরহাজির,
ওকে পাওয়া যাবে না কোথাও।
কান্নার রোল উঠবে বাড়িটায়,
একদিন স্তব্ধ হবে মাতম,
হয়ত থাকবে একটি কি দু'টি
দীর্ঘশ্বাস, কিছু ফোঁপানি'।
পঞ্চভূতে নাস্তির অবাধ উৎসব।
ভেতরে প্রবেশ না-ই বা করলে,
লতাপাতার সবুজ ঘ্রাণ,
প্রজাপতির স্পর্শ বুকের ভেতর নিয়ে
খানিক জিরিয়ে চলে যাও
কোথাও চায়ের আসরে।

আমরা যা লিখি

আমরা যা লিখি তা' নিয়ে হরহামেশা

চলছে এক হৈ হুল্লোড়
অবশ্য লেখকদের নিজ নিজ চক্রে।
এ ওর ঠ্যাং ধরে টানছে,
অমুক তমুকের চৌদ্দ গুষ্টির পিণ্ডি
চটকাচ্ছে, অশ্লীল কেচ্ছা রটানোর মতলবে
ছিটোচ্ছে বিস্তর কালি। থুতু ছুঁড়ে মারছে
আকাশে নিজে গিলে ফেলার জন্যে।
অথচ আমরা যা লিখি তা'
স্রোতের দীয়া বৈ তো নয়। ঢেউগুলি
ওদের মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশে।
কোনো কোনো দীয়া, বলা যায়, যাত্রারম্ভেই
যাবে উল্টে, হবে দম্ভের ভরাডুবি, মধ্যপথে নিভে যাবে অনেকে,
একটি কি দু'টি হয়ত
ভিড়বে অভীষ্ট তীরে। অতএর আমরা যা' লিখি
তা' নিয়ে মিছেমিছি এমন শোরগোল কেন? কী দরকার
লোমশ বুক চাপড়াবার? আখেরে
গুয়ে গড়াগড়ি যাওয়া এতই কি জরুরি?

আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও

প্রিয়তমা, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও দৃষ্টি।
তোমার এই দৃষ্টপাত
কী তেলেসমাত ঘটাতে পারে
জানে না আমার ঘরের টিকটিকি,
ফ্যানের ব্লেডে বসে-থাকা চড়ুই,

বাবুই পাখি আর বাগানে দোল-খাওয়া বুলবুল।
তোমার পিতামাতা জানেন না কী গজ
লুকানো ঐ দৃষ্টিতে। তোমার ভাইবোন, পরিচালিকা,
যারা নিত্যদিন দেখছে তোমাকে, তারা কেউই বুঝতে পারে না
তোমার দৃষ্টিতে
কখন বয়ে যায় নক্ষত্রের স্রোত, কখন
তোমার চোখের বিদ্যুল্লতায় ঝলসে যায় একজন কবির হৃদয়।
এই যে এখন ধীমান সম্পাদক প্রেসে পাঠাবার আগে
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছেন পায়রার বুকের মতো
আমার পাণ্ডুলিপি, তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়
তোমার দু'চোখ শিরাজের হাফেজের মদিরা-উচ্ছ্বল
পানপাত্র; প্রিয়তমা, আমার কাছ থেকে
সরিয়ে নাও তোমার দৃষ্টি। সেই সুরা
প্রাণ ভরে পান করতে পারি,
কিন্তু আমার বুদ্ধি ঢলে পড়ুক অস্তাচলে,
আমি চাই না; প্রেমের শপথ, আমি তা চাই না।
প্রিয়তমা, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও দৃষ্টি।
তোমার অতীত, তোমার বর্তমান,
শাদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া তোমার স্বপ্ন
আর তোমার জাগরণের বোধাতীত সেই দৃষ্টি।
প্রিয়তমা, আমার কাছ থেকে তোমার
দু'চোখ সরিয়ে নাও, যেন আমার বুক
চুরমার না হয়ে যায় ঝড়-ধ্বস্ত পাখির বাসার মতো,
যেন এক ঝটকায় উড়ে না যায় আমার নিরাপত্তার তাঁবু।

আমার সময় চাই

পরিণামদর্শী ছিলাম না কোনোকালে,
তা বলে এমন সাজা পেতে হবে, ভাবি নি কখনো।
নিজকে তখনো এরকম অনাশ্রিত, অসহায়
আমার হয় নি মনে। অপরাধ করি নি, তবুও
অপরাধী বলে শত্রুদল তর্জনী উঁচিয়ে খোলা
রাস্তায় আমাকে নিয়ে সার্কাস বানাবে।
শেষ অব্দি আমাকে নিয়েই যাবে, জানি।
তার আগে আত্মজের শিশু কন্যাটিকে
আরো কিছু কাল আদর করতে দাও; মায়ের মমতা,
আরো যারা হৃদয়ের খুব কাছে আছে
তাদের প্রীতির স্পর্শ পেতে দাও। প্রিয় স্মৃতিগুলিকে আবার
ডেকে আনতে চাই, আর না-লেখা কবিতাগুলি যেন
অভিমানে আমার মানস থেকে মুখ ঢেকে ফিরে
না যায় নিশ্চুপ, দাও, নির্বিঘ্ন, প্রস্তুতি।
আমার ঘরের বই, চায়ের পেয়ালা, আসবাব
কী স্বপ্ন দেখছে আমি এখনো পারি নি জানতে, জেনে
নিতে চাই; সুন্দর আমাকে
করুক নিভৃতে স্পর্শ বার বার, তাহ'লে সহজে
দুর্লঙ্ঘ দেয়াল পার হ'য়ে যেতে পারি। করজোড়ে বলে যাই-
আমার সময় চাই, সৃজনের আরো কিছু স্পন্দিত সময়।

ঈষৎ কম্পনে

নিদ্রার স্থাপত্যে ধীরে হাত রাখে স্বপ্ন, রেশমের
স্বরে কথা বলে, আমি পড়ার টেবিলে-
রাখা মধ্যযুগের কাব্যের ছন্দমিল
আর ব্যালাডের সঙ্গে কথা বলি, নিজের সঙ্গেও মাঝে-সাঝে।
আমি গুটি কয় তাজা রুটি, এক পাত্র মদ আর
বাগানের গোলাপকে সুখস্বপ্ন দেখাতে চেয়েছি
বার বার; হাতের দশটি আঙুলকে
নিভৃতে বানাই মরূদ্যান, পায়ের গোড়ালি হয় ঝর্ণাধারা।
সন্ধ্যাকে পেছনে রেখে শ্রান্ত মুসাফির চলে আসে
সরাইখানায়, দু'ভুরুর মাঝখানে চাঁদ ওঠে,
যেন ছদ্মবেশী ক্ষত। নিজেকে মানিয়ে নেয় পোকামাকড়ের
পছন্দের ডেরায়, পতঙ্গ পুড়ে যায় অগ্নিশিখা ভালোবেসে।
নির্বাসিত রাজপুরষের মতো একা-একটা ঘুরি,
কখনো-বা ভুল পড়ে চলে যাই। বিশ্বস্ততা কাঁটার মুকুট
পরে হাঁটে কায়ক্লেশে, শতাব্দী পেছনে পড়ে থাকে;
স্মৃতি যেন উটের পায়ের চিহ্ন মরুর বালিতে।
প্রতীক্ষার সময় ফুরায়; যার উপস্থিতি এখনো কুয়াশাবৃত,
তার কণ্ঠস্বর অতীতের শ্লোক আওড়ায়।
কিছুই পড়ে না মনে, জানি না চোখের পাতা কেন এই মূঢ়
বেঁচে-থাকা ধরে রাখে ঈষৎ কম্পনে?

উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি

যেদিন শ্রীরামপুরে পা রেখেছিলাম, হাওয়া এসে
চৌদিকে রটিয়ে দিলো সগৌরবে আপনার নাম।

আমি সেই নাম চেতনায় বয়ে অতীতের দিকে
চলে যাই। দেখি, একজন প্রকৃত মানুষ হেঁটে
যাচ্ছেন একাকী কায়ক্লেশ তুচ্ছ করে লোকদের
শোনাতে সুসমাচার। কখনো অধিক রাত অব্দি
জেগে করছেন অনুবাদ বাইবেল বাংলা ভাষা
ভালোবেসে; বাংলা গদ্য করে যাত্রা আধুনিক পথে।
আপনার ছিল টান গাছপালা, ফুল ফল আর
ফসল-ফলানো উদ্যমের প্রতি, শেষ বয়সেও দিতেন
প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে স্বরচিত প্রিয় সেই
উদ্যানের দিকে; জ্ঞান আর মানব প্রেমের বসে
আপনি স্বদেশ ছেড়ে এসেছিলেন বাংলায়, তাই
বাঙালি কবির মনে আপনার স্মৃতি দ্যুতিময়।

উপেক্ষার পর্দার আড়ালে

জমে নি আমার পুণ্য এক রত্তি ভেবে নিয়ে পাড়াপড়শিরা
জনান্তিকে আমাকে হাবিয়া দোজখের অগ্নিকুণ্ডে
নিক্ষেপ করেন দশবার। আল্লা-অলা একজন
আমাকে গাফেল আখ্যা দিয়ে মনে-মনে
এশার নামায শেষে কিছু নসিহতের আহত
সাগ্রহে ছিটিয়ে দেন আমার ওপর।
একজন বাউল ঘুঙুর পায়ে দোতারা বাজিয়ে
আমাকে মনের মানুষের নিগূঢ় সন্ধান দিতে
গান গেয়ে রহেস্যের টানেন। নিয়মিত
নিশীথে জিকির-করা মারফতী একজন জপেন আমার

কানে কানে, ‘আখেরাতে তোমার কী হাল
হবে বেখবর তুমি মুর্শিদ খোঁজো না’!
একজন প্রচণ্ড পণ্ডিত খুব আড়চোখে পর্বত প্রমাণ
আমার অজ্ঞতা দেখে অট্টহাসি হয়ে যান আমার কতিপয়
মেরুদণ্ডহীন লোক, ‘দেখি তোর শিরদাঁড়া কই’
বলে এক ঝটকায় বিকেল বেলায়
আমার চায়ের পেয়ালাটা কেড়ে নেয়,
তরল পানীয় আর নিষ্ঠীবন একাকার। আমি
সব কিছু উপেক্ষার পর্দার আড়ালে রেখে
দেখি হাঁটি হাঁটি পা পা আমার নাতনী
আমারই উদ্দেশে ছুতে আসে। কবিতার
খাতা আপাতত দূরে সরিয়ে ক্ষণিক
শিশুঘ্রাণ বুকে নিয়ে পেয়ারা গাছের নিচে পড়ন্ত বেলায়
পুণ্যস্নান করি।

এ পথে আমার পর্যটন

এ পথে আমার পর্যটন তেমন নতুন নয়,
তবু কেন হঠাৎ একটি মোড়ে এসে
দাঁড়ালে কেমন যেন অচেনা, অদেখা
মনে হয়; আনন্দে ময়ূর হয় চেতনা আমার।
এই গাছ ছিল না কোথাও, এই ঝিল কোনোদিন
পড়েনি সতৃষ্ণ চোখে, এর জলে ডুবাই নি হাত
আগে কিংবা তীরবর্তী ঘাসে
শুয়ে কায়ক্লেশে ধীরে মুছে নিতে করিনি প্রয়াস।

এ পথে বিশ্রাম নিলে বেশিক্ষণ, কখন যে চোখ
নিভাঁজ, প্রগাঢ় ঘুমে বুজে আসে, ঝরে
শুক্‌নো পাতা সমস্ত শরীরে, আহরিত জ্বলজ্বল
আশরফি মাটির ঢেলা হয়ে যায় অবলীলাক্রমে।

একটি তালিকা

(কবি-নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখট একটি কবিতা স্মরণে রেখে)
তানভির আহমেদ খান, প্রতিষ্ঠিত, নামজাদা
লেখক, সাফল্যে তৃপ্ত, অন্ধকার বারান্দায় আজ
আছেন নিশ্চুপ বসে। মনের ভেতর তার কী-যে
তোলপাড়, জানে না দালান কোঠা, গলির জোনাকি।
তবে কি লিখতে না-পারার শুশুনিয়া মাঠ তাকে
করেছে ভীষণ গ্রাস? এইতো সেদিনও তার এক
পয়মন্ত গ্রন্থ হাটে বিকিয়েছে খুব, লেখনীকে
খরা আজো করে নি দখল। জাঁহাবাজ ফ্যাসিবাদী
গোষ্ঠী সদ্য করেছে প্রকাশ এক ঘাতক তালিকা;
সেখানে মুদ্রিত কতিপয় নাম, যেন সূর্যমুখী-
পরিচিত কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, বুদ্ধিজীবী
এবং সংস্কৃতিকর্মী, কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ বান্ধব,
সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, অথচ সেখানে তার
নাম নেই,তাই আজ
অন্ধকারে মুখ রেখে তিনি
বড় বেশি বিচলিত। ‘তাহলে কি আমি, খ্যাতিমান
শব্দশিল্পী, এখনো যথেষ্ট নই প্রগতির পক্ষে?

করি নি কি অচলায়তনে প্রবল আঘাত কোনো?
এই যদি সত্য, তবে আমার সকল গ্রন্থ থেকে
শব্দ মুছে যাক, ওরা ঝাঁক ঝাঁক পতঙ্গের মতো
আগুনে মরুক পুড়ে। ইচ্ছে হয়, গ্লানি আর ক্ষোভে
চুল ছিঁড়ি, মাথা ঠুকি নীরেট দেয়ালে; ইচ্ছে হয়,
ফ্যাসিবাদীদের দরবারে নতজানু হ'য়ে বলি-
দয়া করে তালিকায় আমার নামটি লিখে নিন'।

একটি দুপুর

শহরে দুপুর ছিল, হৃদয়েও প্রখর দুপুর;
কে এক নবীন পাখি পাহাড়ের নিভৃতির ফুল,
সতেজ ঘাসের ঘ্রাণ, ঝর্ণার জলজ স্মৃতি নিয়ে
আমাদের দু'জনের ওপর ঝরালো বুনো সুর।
তখন ছিল না মনে কী তোমার না, বিয়ে-টিয়ে
কখনো হয়েছে কি না, না কি তুমি সরল বিধবা!
আমাদের চতুর্দিকে বাংলা প্রজাপতি, দূর
আফ্রিকার ড্রামের সঙ্গীত; দেহমন রক্তজবা।
সারা ঘরে তুমি রঙধনু, সমুদ্রের ঢেউ, দু'টি
মানুষের কী মধুর আলিঙ্গন অনন্তের পটে
আঁকা হয়ে যায় আর হৃৎপিণ্ডে গির্জার ঘন্টাধ্বনি;
আমরা দু'জন নীল স্বপ্ন হই, ফুল হ'য়ে ফুটে।
যখন তোমাকে দেখি, মনে হয়, এই মাত্র তুমি
স্বপ্নের কোরক থেকে জন্ম নিয়ে দাঁড়িয়েছ পাশে
নবীনা, নতুন শিল্প সৃষ্টি হবে বলে। আমাদের
হৃদয়ের কান্না-ভেজা মাটি সে শিল্পের জন্মভূমি।

তোমার কি মনে পড়ে সেই দুপুরের মাতলামি
কর্মময়তার কোনো ফাঁকে? যখন বারান্দা থেকে
বৃষ্টি দ্যাখো, তখন কি ভাবো বিগত-যৌবন এক
কবিকে নিঃসঙ্গতায় শরীর আহত স্বপ্নে ঢেকে?

একদা যাদের নাম

একটি গাছের হাত অভিবাদনের
ভঙ্গিতে আমার দিকে উঠে আসে; তাকে
কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে যাই। হাত নাড়া
দেখি, দূরে পাথরের বুকে
জলরেখা ফোটে, তবু গলে না হৃদয়
মানুষের।
বীণার ধ্বনিকে বোবা করে
এখন প্রধান হয়ে ওঠে
অস্ত্রের ঝংকার, চারা গাছের পাতারা
ছোরার আদলে বাড়ে। এক পাল জন্তু
সগৌরবে হেঁটে যায় বিপুল আঁধারে,
একদা যাদের নাম মানুষ বলেই জানা ছিল।

কবন্ধের যুগ

‘এমন বৈভব আমি দেখিনি কখনো’, বলে এক পর্যটক
নগরের দীপ্র দরদালানের দিকে অনিমেষ
তাকান, করেন স্তুতি। দিকে দিকে বিস্ময়-জাগানো

নানা শিল্পে। প্রবীণেরা করেছেন জ্ঞানের সাধনা
আজীবন, মিলিত উদ্যোগে সভ্যতার
সৌধে রেখেছেন কিছু সৃষ্টির স্বাক্ষর। এ নগরে
তরুণ-তরুণী যারা, তারা গ্রন্থ-অনুরাগী; নিসর্গ, প্রযুক্তি,
প্রণয়, সৌন্দর্য, নীতি ইত্যাদির প্রতি
অর্ঘ্যদানে অনলস,-পর্যটক বিশদ জানেন
এ কী হলো? অকস্মাৎ এ কেমন ভূকম্পন? সৌধ ভেঙে পড়ে,
বৃষ্টিপাত, অগ্নিবৃষ্টি। হাহাকার ওঠে
চতুর্দিকে; লুণ্ঠনে হত্যায় মাতে মাতাল দস্যুরা। এ নগরে
এরকম বর্বরতা অন্তরালে ছিল
ভেবে পর্যটক খুব বিমূঢ় বিহ্বল।
দর্শন, নৃতত্ত্ব শিল্প পেঁচার চিৎকারে লুপ্ত হয়
লহমায়; শেয়াল ও নেকড়েরা সদম্ভে রটায়-
‘কবন্ধের যুগ হলো শুরু প্রণতি জানাতে হবে মূঢ়তাকে।
প্রতারিত পর্যটক ছায়া দেখলেই পেছনে দাঁড়ান সরে,
যেন তার দিকে তেড়ে আসে
মনোহীন হন্তারক। পাখিরা নিশ্চুপ বড়, নক্ষত্রমণ্ডলী ঢাকা পড়ে
ধূমায়িত অন্ধকারে, আর্থ ইতিহাস, শুধু জেগে থাকে পেঁচার চিৎকার।

কবির কন্ঠস্বর

সীসার মতো আকাশ বিনত, গাছগুলি
স্থাপত্য, তরতাজা রৌদ্রর রঙে
অকস্মাৎ ধরেছে জং;
ক’দিন ইঁদুরগুলোর

জোটে নি এক কণা খাদ্য,
বাঁধানো কবরগুলোয় মস্ত ফাটল।
পেঁচা মূক, স্থবির; শ্মশান পেরিয়ে
সৌন্দর্য ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় লীন।
একজন কবির বুক
বুলেটে ঝাঁঝরা করে উল্লাসে মত্ত ওরা।
ঘাসবঞ্চিত মাটি
সন্তানহারা জননীর মতো
দমকে দমকে ডুকরে ওঠে আর
কবির কণ্ঠস্বর অমর্ত্য উৎসব
স্পন্দমান লোকালয়ের অন্তরে।

কাল রাতে স্বপ্নে

কাল রাতে স্বপ্নে আমি লালনের আরশি নগর
দেখেছি অনেকক্ষণ, মনে হয়, আলো-আঁধারিতে।
কেমন পড়শি ছিল কাছে, ধারে, কিবা তার ঘর
দোর, মনে নেই, বুঝি দেহ তার রঙিন শাড়িতে
ছিল ঢাকা, চোখ দু'টি টানা টানা, অত্যন্ত গভীর,
ছুঁতে গিয়ে তাকে আমি গহীন গাঙের জলরেখা
যেন বা করেছি স্পর্শ, পরিচিত এই গ্রহটির
কেউ নয়, বুঝি তাই আজো প্রকৃত হয় নি দেখা।
লালনের গানের আড়ালে যার পদধ্বনি বাজে,
বাউলের দোতারার সুর যাকে করে বন্ধনীয়,

এ আমি কী করে পাবো তাকে আমার সকল কাজে?
‘সে আছে নদীর পাশে সুর হয়ে, তাকে চিনে নিও,’
বলেই বাউল এক অগোচরে করেন প্রস্থান,
সাথে সাথে আমার নগর হয় লালনের গান।

গরিলারা দলে দলে

গরিলারা দলে দলে তড়িঘড়ি কামিজ পাৎলুন
পরে মসজিদ গুঁড়ো করে আর আগুন ধরায়
দেবালয়ে; মানুষের স্বপ্নের বসতি পোড়ে, তাজা
রক্ত বয় পথে, ত্রাস-তাড়িত তরুণী মূক হয়
যূথবদ্ধ লালসার লকলকে নিঃশ্বাসে এবং
গরিলারা ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ে শহরে ও গ্রামে।
কালপুরুষের মুখে পড়েছে বিস্তর চুনকালি,
সূর্যের জ্বলন্ত চোখ থেকে অবিরল অশ্রু ঝরে,
পৃথিবীর দৃশ্য দেখবে না বলে সূর্য বন্ধ করে
চোখ, দুপুরেই ঘোর অমাবস্যা নামে দিকে দিকে।
গালিবের গজলেরা ঘাতকেরা অস্ত্রের ছায়ায়
অশ্রুপাত করে নিশিদিন, রবীন্দ্র রচনাবলী
ব্যর্থতায় অপমানের অবনত, মিলনের ভগ্ন
সেতু দেখে নজরুল নষ্ট নীড়ে বুক চাপড়ান।
কান্নাও আসে না আর; প্রতিবাদ শরাহত পাখি,
যা’ কিছু গৌরবদীপ্ত ত্রস্ত সব বিবরে লুকায়।
মানুষকে দেখেই মানুষ প্রাণপণে পালাবার
পথ খোঁজে, বন্য পশুদের আজ বড় হাসি পায়।

গান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে

গান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে, নিরিবিলি
বসে নিশীথের ঘাসে, সমাধিতে। কখনো দেখিনি
তাকে, ছিল কুয়াশার মতো
ছায়ার মেদুর করতলে, পথের চিবুকে লীন।
কিছু কি বলার ছিল তার? চেয়েছিল
নামাতে প্রানী গুরুভার? চিন্তার নিমগ্ন স্তরে
তার ছায়া সঞ্চরণশীল, আমার হাতের কাছে
জল হয়ে বয়ে যায়, নাচের আমার ঠোঁটের ফাঁকে।
এরকম হ'তে থাকে বার বার। ফুলে বোঁচায়,
মৌমাছির সোনালি গুঞ্জনে মিশে থাকে;
কখনো বেরিয়ে আসে কবিতার পংক্তির হৃদয়
ছিন্ন করে, কিন্তু সে আমার ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।
পুরুষ অথবা নারী নয়, হঠাৎ লাফিয়ে-ওঠা
মাছ নয়, দেবতাও নয়, নয় কোনো প্রেতযোনি;
তবু আছে মিথ্যার উচ্ছল হাটে সত্যের চেয়েও সত্য হয়ে
নিত্যদিন ব্যবহৃত শব্দের আড়ালে, যেন মেঘে-মেশা হাওয়া।

ঘুম ভেঙে গেলে

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে স্মৃতি মুড়ি দিয়ে শুই
পাশ ফিরে, দেয়ালে নজর, যেন সেখানে স্বপ্নের
কিছু টুকরো লেগে আছে। কারো হাতে ঘড়ি দোল খায়,
জানালা-পেরুনো হাওয়া মেশে
নিদ্রাছুট শরীরে আমার, বোধাতীত
বোধ তৈরি করে ভিন্ন পরিবেশ, অদূরে দাঁড়ানো

কেউ, হাতে ফলময় স্বর্ণথালা দূর তাহিতির,
আমি তাকে শনাক্ত করায় উদাসীন, বেড়ালের ছায়া দেখি।
উপর কাঠামো ভেঙে পড়ে; আমার নজর থেকে
যেন এই গাছপালা, তীরে-বাঁধা নৌকো, আলোজ্বলা
ফ্ল্যাটবাড়ি, বন্ধনমালার ধোঁয়া, প্রিয় মুখগুলি
আর বইপত্র লুপ্ত না হয় কখনো

ঘুরে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

(হিতেশ মণ্ডলের স্বগত ভাষণ)
আমাকে বলছ ঘুরে দাঁড়াতে, অথচ
ঘুরে দাঁড়াবার মতো জায়গা
পাচ্ছিলো যে। আমি খুব কিনারে গিয়েছি চলে, তুমি
জেনে গেছ, তবু কেন ঘুরে দাঁড়াবার
বুলি ফোটে তোমার এ মুখে? ওরা তেড়ে
আসে এই শান্ত মাটি কাঁপিয়ে যখন, ঘরদোর
নড়ে ওঠে চিৎকারে, তখন তুমি কেন
আনো না ছুটে? আজ ঘুরে দাঁড়াবার
পরামর্শ বড় ফাঁকা, বড় ফাঁকা মনে হয় এই
সর্বনাশগ্রস্তকালে। ঘুরে দাঁড়াব না।
যত পারে আমাকে দেখাক ভয়, আমি মৃত্তিকায় মিশে যাব।
আমার ঘরের পোড়া মাটি, দলিত পীড়িত
লতাপাতা দেখুক আমার নত মাথা,
দেখুক দোয়েল আমি কেমন নিস্তব্ধ
প্রস্তরখণ্ডের মতো। আমার তরুণ সহোদর

ভিটেমাটি ছেড়ে ছুড়ে বেগানা দিগন্ত পানে ভয়ে
জড়সড় চলে যেতে চায়-এই সব দেখে নিক দেবতার
ভাঙা হাত, মা দুর্গার মুণ্ডহীন অগ্নিদগ্ধ ধড়।
বন্ধু, আর বেশি দেরি করো না, একটু
ঘুরে দাঁড়াবার মতো জায়গা দাও, এক্ষুণি দাঁড়াই।

চিরকেলে প্রশ্ন

আবীর-ছাড়ানো সকালে তুমি এলে আমার ঘরে। পড়ছিলাম
মিশেল ফুকোর
'উন্মত্ততা এবং সভ্যত। উন্মত্ততা কি আমাকে
স্পর্শ করতে চাইছে? তোমাকে দেখেই
নড়ে-চড়ে বসি; তুমি জিগ্যেশ করলে
স্বতঃস্ফূর্ত হেসে, 'কী করছো?'
'এইতো এমন কিছু নয়', বলে
মিশেল ফুকোর বই রেখে দিলাম টেবিলে।
সারা ঘরে ছড়ানো তোমার ঘ্রাণ,
যেমন জীবনানন্দের কবিতায় রূপরসগন্ধ।
বেশিক্ষণ ছিলে না তুমি,
কয়েকটি কথা বললে, যেন সরোবরে বুদ্বুদ।
এমন কি চা খাওয়ার জন্যেও অপেক্ষা করলে না,
একটা লিটল ম্যাগাজিন উল্টে পাল্টে তুমি রাস্তায়।
কেন এসেছিলো-এই প্রশ্ন আমার দিকে
ছুঁড়ে দেয় কবিতার খাতা, পেয়ারা গাছের পাতা।

উত্তরবিহীন আমার বসে-থাকা শূন্য ঘরে,
তোমার হাতের স্পর্শময় লিটল ম্যাগাজিন হতে চায় দোয়েল।
আমার ঘর তোমার ঘ্রাণ সেই কখন থেকে
বুকে চেপে রেখেছে যক্ষের মতো,
এই আশ্চর্য ঘ্রাণ হারিয়ে যাওয়ার আগে
তুমি কি আসবে আবার?

ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে

অকস্মাৎ বাষট্রির এই ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে
একি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। আকাশটা বুঝি
ভাঙল কাচের বাসনের মতো আর
গাছপালাগুলোর মাতন
যেন ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর নাচ,
শেকড় বাকড় ছেড়ে দেবে ছুট। মুখের উপর
তোমার চুলের ঝাপ্টা। আমি পথ দেখি না, আকাশ
অথবা চলন্ত যান-কিছুই দেখি না,
এই দুরু অনুভবে
আমার কেবল তুমি। কখন যে বিদ্যুতের মতো
ঝল্‌সে উঠে নেমে গেলে পথে,
আমার চাতক ব্যাকুলতা তোমাকে পেল না খুঁজে।
অন্ধ ভিখারির ব্যগ্রতায়
নিঃশব্দে কুড়াতে থাকি টুকরো টুকরো কথা,
তোমার বিব্রত দীর্ঘশ্বাস, ভাঙাচোরা
আমার স্বপ্নের ফিসফিস।

বাষট্রির এই ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে
কোথায় খুঁজব ডেরা? নিজের শরীর থেকে মুঠো
মুঠো ছাই উড়িয়ে, ফুরিয়ে আয়ু-রেণু
টলতে টলতে আজ এইতো আমার পথ চলা।

ছায়ায় আমেন

হেঁটে হেঁটে আমি কি এখন খুব ক্লান্ত? কায়ক্লেশ
পা দুটোকে ঘুম
পাড়িয়ে রাখার জন্যে কী একটা গান
গায় বৃক্ষতলে গোধূলিতে। এ পথের রেখা ধরে
ইতিহাস আর আমি হেঁটে যাচ্ছি। একটি পাখির
কলস্বর দিগন্তের চিবুকে বিস্ময়
জাগিয়ে কেমন উড়ে যায়,
যেন টুক্‌রো মেঘ; দেখ, এবার আমার
সত্যিকার লেখার সময় এল। এতকাল শুরু
গোলকধাঁধায় ঘুরে কেটেছে সময়।
প্রকৃত আলোর বীজ আবিষ্কার করি,
আবিষ্কার করি স্বপ্ন আর বাস্তবের দৃষ্টিপাত।
কলমের আঁচড়ে আবার বেঁচে উঠি।
নিজের ধরনে শূন্যতার মুখোমুখি।
নিদ্রার ঠোঁটের ফাঁকে কবিতার ফল
পুরে দিয়ে সরিয়ে রাত্রির পর্দা প্রত্যুষের খুব
টলটলে সরোবরে দিই ডুব। ভর দুপুরের
হৈ-হুল্লোড়ে আমার কবিতা

যীশুর রক্তাক্ত শরীরের মতো ঝুলে থাকে ক্রমশ। কারা যেন
অদূরে দাঁড়িয়ে বলে, 'লিখে রাখো ছায়ায় আমেন'।

ঝড়

ঝড়ঝঞ্ঝা নিয়ে আছি আমরা সবাই চিরদিন;
কত ঘর প্রায় প্রতি বছর যায় যে উড়ে আর
মাঝে-মাঝে জলোচ্ছ্বাস বসতি নিশ্চিহ্ন করে, মনে
অগণিত নরনারী, শিশু। পশুপাখি, গাছপালা
ধ্বংসের গহ্বরে যায়, এমনকি তৃণমূল মাটি
ছেড়ে শূন্যে ধায় এলোমেলো, অনন্তর মুষলের
বৃষ্টি হয়ে ঝরে অবিরত কত শত নিকেতনে।
চাই না এমন ঝড়, স্বৈরাচারের মাতন আর।
বরং আসুক সেই ঝড়, যার মত্ততায় পাকা
ফসলের ক্ষেত নয়, কলরবময় জনপদ,
প্রাণিকুল নয় আর ধ্বংস হোক মৌল দানবের
দাপট সন্ত্রস্ত দেশে দেশে; অবিচার, অনাচার,
সকল অন্যায় নিমেষেই কড়ের কুটোর মতো
ভেসে যাক, লোপ পাক অশুভ শক্তির চণ্ড নীতি।

তবে কি বৃথাই আমি

তবে কি বৃথাই আমি তোমার ইঙ্গিতে দিগ্বিদিক
ঘুরেছি ধারালো শীতে, দুঃসহ গরমে এতকাল?
হায় কী বিভ্রমে ম'জে দিনরাত্রি এক মজা খাল

সেচে সেচে দুহাতে তুলেছি কাদা নদী ভেবে ঠিক।
চতুর্দিকে কৌতূহলী লোকজন ‘ধিক, তোকে ধিক’
বলে উৎপীড়ক চোখ রাখে আমার ওপর, গাল
দিয়ে কেউ কেউ গদ্যে করে আমাকে নাকাল।
যত পারে ওরা গাত্র ঝাল তুমুল মিটিয়ে নিক।
আমার বলার কিছু নেই, নিঃসঙ্গ থাকব বসে
অন্তরালে, ছায়ায় ভেতর থেকে যদি সুন্দরীর
আভাস চকিতে ফোটে, আলোড়নে কিছু পাতা খসে
পড়ে, তবে আমি তার উদ্দেশ্যে বলব সুনিবিড়
কণ্ঠস্বরে, তোমাকেই ঈশ্বরি মেনেছি আমি, তাই,
মনিরত্ন কিংবা ভস্ম যা-ই দাও, কোনো খেদ নাই।

তাচ্ছিল্য উজিয়ে

‘এখানে এসে কি ভুল করলাম?’ এই প্রশ্ন তাকে
চঞ্চুতে স্থাপন করে। উস্‌কো খুস্‌কো চুল, গালে দাড়ি
কামানোর কাটা দাগ, শার্টের কলারে এক টুকরো
ঘাস, যেন স্তম্ভিত টিকটিকির জিভ।
এখানে আসার আগে ছিলেন নির্জন মাঠে শুয়ে। মেঠো ঘ্রাণ
ঘিরে আছে তাকে, বুঝি উদ্ভিদের প্রাণ তার মাঝে
সঞ্চারিত; কেউ তাকে আড় চোখে দ্যাখে, কেউ কেউ
উপেক্ষার ডগায় নাচিয়ে কিছুক্ষণ ভিন্ন দিকে
নজর ফেলায়, তিনি তাচ্ছিল্য উজিয়ে বললেন,
‘এসো কোণে, একা গুঞ্জনের অন্তরালে’।
চোখে তার দূর দূরান্তের ছায়া। একে-একে ক’জন অতিথি

কণ্ঠে ভাষণের মনোহর নক্‌শা ফুটিয়ে প্রচুর
সুখ্যাতি পেলেন, সারা ঘর করতালিময়।
এবার বলার পালা তার। অপ্রস্তুত,থতোমতো,
গলায় কিসের দলা বাক্য-রোধক, হঠাৎ তার
দু' ভুরুর মাঝখানে রঙধনু জেগে ওঠে, ভোরের শেভের
কাটা দাগে দোলে পুষ্পরেণু, কণ্ঠে ফোটে
অচিন পাখির ধ্বনি। সারা ঘর নিস্তব্ধ প্রান্তর।

তিনজন

জ্যোৎস্নার আদর খেয়ে চিতাবাঘ শোভার ভেতর
নিভৃতে ঘুমায়। অকস্মাৎ খসখস
শব্দে লাফাবার ভঙ্গি রচিত, দু'চোখ
ফস্‌ফরাসের কণা ছড়ায়, আঁধার শিহরণে নববধূ,
পেশী টান টান, জ্যোৎস্না পান করে তার
সমগ্র সততায় মদিরতা জেগে ওঠে, পরিপক্ক নিশীতের
মাংস দাঁতে গেঁথে খুঁজে নেবে
ঝোপের আড়াল, পাবে শব্দ শিকারির হরফের
মমতা এবং বাংলা কবিতার বুকে
চোখের আগুন তার রত্ন দশকের পরপারে।
দুর্ধর্ষ শিকারি কালো বন্দুক উঁচিয়ে ধরে সেই
চলমান ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের দিকে।
কবির কলম বন্দুকের নলটিকে মূক করে
দিতে চায়, গুলির আওয়াজ ফেটে পড়ে, ঘন বন
আর্তনাদ, বিষাদ ভাসতে থাকে জ্যোৎস্নার প্লাবনে,

কলম এবং কবি রক্তস্নাত, শিকারির পদতলে নিঃস্পন্দ, নিথর।

তুমি

কিয়দ্দূরে ইঁদারার কাছে দেখি একটি তরুণী
পেয়ারা গাছের পাতা ছোঁয় মমতায়,
তার শরীরের চমকিত
মুদ্রায় তোমার উপস্থিতি ভেবে কাছে যাই; ভুল ভেঙে যায়।
একটি মেয়েকে দেখি রেস্তোরাঁয় বসে আছে একা;
কফির পেয়ালা শূন্য, দু'টি হাত টেবিলে স্থাপিত।
তাকে তুমি ভেবে প্রায় বলে ফেলি, 'ভীষণ লজ্জিত, কতক্ষণ
বসে আছো?' নিজের বিভ্রমে লজ্জা পাই।
একদিন মফস্বলী ইস্টিশানে কুয়াশার রাতে
ওয়েটিং রুমে তুমি বসে আছো বিষণ্ন, সুন্দর।
কোথায় চলেছ, কত দূরে? কুয়াশা তোমাকে গিলে খেলো, দেখি
অপরিচিতার হাই; নিষ্প্রভ রাত্রির দিকে খানিক তাকাই।
বেশ কিছুদিন পর সেদিন বিকেলবেলা তোমার নিবাসে
নিভৃত ড্রইংরুমে বসে আছি অস্থির, ব্যাকুল।
তুমি এলে, ট্রলিতে চায়ের সরঞ্জাম; কথা হলো
নিছক মামুলি কিছু। এ কাকে দেখছি? হায়, তুমি নও তুমি।

তৃতীয় পক্ষ

রক্তচক্ষু রাম বলে রহিমকে, 'এই দ্যাখ আমার রামদা,

তোকে বলি দেবো’
রহিম পাকিয়ে চোখ বলে রামকে, ‘বেদ্বীন, এই
তলোয়ার দিকে তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে
কুত্তাকে খাওয়াবো’। অনন্তর
রামদা এবং তলোয়ারে কী ভীষণ ঠোকাঠুকি।
একজন প্রশান্ত মানুষ, অস্ত্রহীন, ছুটে এসে দাঁড়লেন
দু’জনের মাঝখানে, কণ্ঠে তার অনাবিল মৈত্রীর দোহাই।
দু’দিকেই দুই অস্ত্র দ্বিধাহীন হানে তাকে। নির্মল, নির্বাক
আসমান দ্যাখে রক্তধারা বয়ে যায় চৌরাস্তায়।

তোমার নাম এক বিপ্লব

আগুনে-পোড়া তরঙ্গের মতো আমার স্বপ্নগুলোকে
গোছানোর ব্যগ্রতায় অধিক
এলোমেলো করে ফেলি। আমার স্বপ্নগুলোকে
যারা পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের আস্তানায়
আজ মোচ্ছব। আমি আমার আর্তনাদকে
মেঘের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে
আগুন রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ার মধ্যে
মুখ লুকাই।
এক সম্পাহ ধরে লেখা কয়েকটি কবিতার
পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফিপ্‌সি
হাওয়ায় উড়িয়ে দিই; আমার মুখমণ্ডলে
লেগে-থাকা কৃষ্ণচূড়ার ভগ্নাংশসমূহ
আমাকে কোনো আদিবাসীর

আদল দেয়। ক্রোধ
আমার হৃদয়কে ক্রমাগত পোড়াতে থাকে আর
আমি দিগন্তে দেখি তোমার মুখের উদ্‌ভাসন।
আজ জানালার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছি
সূর্যোদয়ের চুম্বনের প্রত্যাশায়।
আকাশের চাঁদ মাঝে-মধ্যে
ঢাকা পড়ে মেঘের বোরখায়
আবার পর মুহূর্তেই প্রস্ফুটিত
মুক্ত চিন্তার মতো।
কোনো কোনো গ্রন্থের হরফের অপ্রতিরোধ্য মিছিল
বদলে দিতে পারে সমাজকে।
সেরকম বহু বইয়ের সারাৎসার তুমি
নিজের অজ্ঞাতেই ধারণ করেছিলে।
আমার মনে পড়ে যায়, তোমার মৃতদেহ
১৯৭৫টি বুলেটে বিদ্ধ,
তোমার তর্জনী উদ্যত সূর্যোদয়ের দিকে।
কেউ দ্যাখেনি সেই মৃতদেহ থেকে
বেরিয়ে এসেছেন এক অগ্নিপুরুষ,
যিনি ছাপ্পান হাজার বর্গমাইলের
প্রতিটি পথে হেঁটে যান
পাখি, জলধারা, রৌদ্র-জ্যোৎস্না এবং
মেঘমালাকে দীক্ষিত করতে
কৃষ্ণচূড়া আর স্বর্ণচাঁপা ছড়াতে ছড়াতে।
কৃষকের কুটির, বস্তির খোলার ঘর
মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাট, আত্মমগ্ন কবির দৃষ্টি,
ঝাঁঝালো দুপুরে মিছিলের শত শত মুখ

শনাক্ত করছে তোমাকে।
তোমার নাম নতুন সূর্যোদয়ের মতোই
এক বিপ্লব, যার অন্ধকার-তাড়ানো
রুদ্র সৌন্দর্য দেখার প্রত্যাশায়
আমি দাঁড়িয়ে আছি জানালার খুব কাছে।

দোদুল্যমান

সে বসেছিল তার প্রশস্ত বারান্দায়
শরীরে যৌবনের গোধূলি নিয়ে। আমি,
বার্ধক্যের দোরগোড়া-পেরুনো, তার মুখোমুখি
অন্ধকারের ডানার রেশমি ছায়ায়।
একটি ক্লান্ত পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দে
চিড় ধরে নিস্তব্ধতায়, হঠাৎ এক সময়
মনে হলো, সে নেই এই সন্ধ্যাময় বারান্দায়,
তার জায়গায় স্থাপিত
প্রসিদ্ধ কোনো ভাস্করের শিল্পিত পাথর।
সেই ভাস্কর্য এবং আমার মাঝখানে
দুলতে থাকে, ক্রমাগত দুলতে থাকে
আমার একটি না-লেখা কবিতা।

দ্বিতীয় পাখি

আজ থেকে দেখব সকালসন্ধ্যা আমি মেঘেদের,
পাখিদের ভেসে-যাওয়া। আবার দেখব ভালো করে

কী করে গাছের পাতা, ভোরের শিশির পাতা থেকে
ঝরে যায়। বাগানের মৃত্তিকার পোকা মাকড়েরা
কী ভাবে খুশিতে ঘোরাঘুরি করে চেনা এলাকায়,
দেখে নেব। বহুকাল জঙ্গলের মাথায় চাঁদের
মুকুট দেখি নি; ঝিলে মুখ ডুবিয়ে চিত্রল কোনো
হরিণের জলপান অদেখা রয়েছে কতকাল।
বড় বেশি হৈ চৈ ছিল চতুর্দিকে, ছিল জামা ধরে
টানাটানি আর গলা ফুলিয়ে বাক্যের ফুলঝুরি
তাৎপর্যহীনভাবে ছোটানো, বাজানো, ডুগডুগি
মেলায়; এখন সঙঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে
নদীতীরে কিংবা শাল তাল তমালের বনে ঘোরা,
কবর, কোকিল, ঝর্ণা, পাকদণ্ডি দেখা, শুধু দেখা।

ধোঁয়াশায়

এইমাত্র কবিতার মনোহর বাড়ি থেকে একলা, উদাস
বেরিয়ে এলেন তিনি। কিয়দ্দুরে আড়ালে দাঁড়িয়ে
ঘন ঘন ফুঁকছেন সিগারেট; ধোঁয়া
ঘিরে ধরে তাকে, কাছে ধারে
তরুণ কবিরা নেই, কেউ নেই, কোথাও গুঞ্জন নেই কোনো;
তিনি একা, আজ বড় একা, দুঃখের কাফনে মোড়া।
একদা ছিলেন মিছিলের প্রথম কাতারে, মুখে
ফুটতো শ্লোগান স্ফূলিঙ্গের মতো, যেন
নিজেই পতাকা, এরকম উড়তেন জনারণ্যে কী সুন্দর।
অধুনা বিবরবাসী, অন্য কাউকেই

নয়, নিজেকেই বেশি দ্যাখেন চৌদিকে। জপতপ
আছে বটে, আছে সন্ন্যাসীর মতো মন্ত্রের সাধনা।
এগিয়ে গেলাম তার দিকে। এক রাশ ধোঁয়া থেকে
কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আরে তুমি, কী অবাক কাণ্ড,
তুমি এলে অবশেষে এ নির্জন কোণে? ভুল ছবি
দেখছি কি? আজকাল আমাকে গলিতে কুষ্ঠরোগী
ভেবে কেউ ঘেঁষে না নিকটে। হা, আমার কিবা দিন কিবা রাত্রি'।
'আপনার কাছে আমি কবিতার ডৌল দেখে নেব', জানালাম।
'পদ্য রাখো, আমাকে একটু স্পর্শ করো, বহুদিন মানুষের
নিঃশ্বাস লাগে না গায়ে, ছোঁয়া না আমাকে কেউ আর।
কারো দিকে প্রীতিবশে তাকালেও তার
দৃষ্টি বড় বেশি ঠাণ্ডা মনে হয়; হায়,
এর চেয়ে তাচ্ছিল্য বরং ভালো, বলে তিনি যেন নক্ষত্রের
সঙ্গে কিছু কথা সেরে নেয়ার তাগিদে ধোঁয়াশায় মিশে যান।

নব্য মানবের স্তব

অন্ধকার ঘোর অন্ধকার উবু হয়ে বসে আছে
হতাশার কোলে, ধসে-যাওয়া ঘরবাড়ি
ভাঙাচোরা থামগুলি দুঃস্বপ্নের স্মৃতি
নিয়ে অবনত, মধ্যরাতে এমিয়ার কপোতেরা
এক সঙ্গে আর্তনাদ করে।
য়ূরোপের আত্মাহিম শীত নেমে আসে হা-হা স্বরে
এমিয়ার ঘরে ঘরে, খানিক উত্তাপ

সকলের প্রার্থনার প্রধান প্রস্তাব, মৃত্যু অন্তরালে হাসে
বাঁকা হাসি; জানে
তরুপের তাস তার হাতেই গচ্ছিত। গ্রন্থপাঠ,
সমাজের যাবতীয় রীতিনীতি বেবাক অসার। সর্বনাশ
গ্রাস করে দশদিক, সর্পাহত অক্ষর সাজায়।
ভ্রান্তি পথপ্রদর্শক জেসে খুব দ্রুত হেঁটে যায়,
অনুসারীগণ অন্ধকারে,
কেবলি হোঁচট খায় খানাখন্দে, কেউ কেউ ভীষণ আটকে
পড়ে কাঁটাবনে, যে গ্রন্থের পাতা ওরা
ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ার উড়িয়ে
দিয়েছিল, তার প্রয়োজন তীব্র বোধ করে অনুশোচনায়,
উত্তুরে হাওয়ার দিকে দগ্ধ মুখ রাখে। শত্রুতায়
উন্মুক্ত আক্রোশে যে মূর্তিকে করেছে আঘাত, তাকে
সম্ভ্রমের পতাকা জড়িয়ে
আবার করাবে দাঁড় অনেক উঁচুতে, মনে হয়।
তখন নক্ষত্রপুঞ্জ মহিমার সুর হয়ে বাজবে ব্যাপক,
ধূর্ত শেয়ালেরা, নেকড়ের পাল বেদিশা পালাবে বহুদূরে,
এশিয়ার ঘরে ঘরে উঠবে জ্বলে প্রকৃত জ্ঞানের শিখা আর
কবির হরফ হবে নব্য মানবের স্তব, নিত্য সহচর।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সৈকতে

আমার ভেতর থেকে আশ্চর্য এক যুবক
সামুরাই তরবারির ঝলসানির আঙ্গিকে
বেরিয়ে সরাসরি হেঁটে যায়

তোমার নিবাসে রাস্তার ভিড় আর
কোলাহলের চারদিকে পর্দা টেনে দিয়ে।
তুমি তাকে না দেখে
তাকাও এক স্তূপ ধূসরতার দিকে;
তোমার ভুরুর মাঝখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলক।
এই হাত দুটো আমার, দেখ এই
এক জোড়া চোখ, এই ওষ্ঠ আমার;
শোনো, বুকের এই ধুকপুকুনি আমার-এক স্তূপ ধূসরতা
ব্যাকুল কণ্ঠস্বর।
সেই কণ্ঠস্বর তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে,
মনে হয় না। তুমি জানালার
বাইরে তাকিয়ে আছো, যেন একটি একটি করে গুনছ
পাখির পালক, জেনে নিতে চাইছ গাছের পাতার
রহস্য। তোমার উদাসীনতায় প্রতিহত
কণ্ঠস্বর আত্মসমর্পণ করে স্তব্ধতার হাতে।
কিছুতেই তোমাকে বুঝতে পারি না আমি,
যেমন একট বাই চার পাঁচবার পড়বার পরেও
তার মাথামুণ্ড কিছুই
বোধগম্য হয় না নিবিষ্ট পড়ুয়ার।
বলেই ফেলি তোমাকে ঘিরে অষ্ট প্রহরের
ছটফটানি আমার ছুটির দরখাস্ত
দাখিল করেছে দিনের আলোকরশ্মি আর নক্ষত্রের কাছে
এবং আমার ভালোবাসা
গ্রীষ্মমণ্ডল ছেড়ে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের
সৈকতের চিকচিকে বালিতে শুয়ে রোদ পোহায়।

নাবিক

শাদা পোশাকের লোক, মাথায় সফেদ টুটি, ছিল
বন্দরে বন্দরে, আমাদের
পরিচিত, তাসের আড্ডার একজন। মাঝে-মাঝে
কী-যে হতো তার, তাস ফেলে
জমাট টেবিল ছেড়ে ছুড়ে যেতো চলে,
যেন সে শুনেছে গান জলকন্যাদের। নাম তার কখনো হয় নি জানা।
কোথায় যে গেল
এ নিয়ে আমরা কেউ ঘামাই নি মাথা কোনোদিন।
চাঁদের বন্দি সে, শোনা গেল, জ্যোৎস্নার মায়ায় মজে
হঠাৎ হারিয়ে গেছে ঘোর সামুদ্রিক কুয়াশায়।
অনেক বছর কেটে যায়, বার্ধক্য ছুঁয়েছে আমাদের
তাসের আড্ডার সঙ্গীদের, আমাকেও;
কেউ আত্মভোলা, কেউ স্মৃতি সচেতন, কেউবা স্তিমিত খুব।
একদিন যথারীতি তাসের টেবিলে বসে দেখি
এসেছে সে ফিরে, শাদা পোশাকের যুবা, কী আশ্চর্য, চোখ তার
মুক্তো এক জোড়া, ওষ্ঠে অপার্থিব নীরবতা আর
সমস্ত শরীর থেকে ঝরে
অবিরল সমুদ্রের ফোঁটা ফোঁটা সবুজাভ জল।

নিজের পায়ের দিকে তাকাতেই

আমাকে কেউ ইশ্বরের প্রতিদ্বন্দী বলে
সম্বোধন করল কি করল না তাতে আমার

কিছু যায় আসে না। আমার স্তুতি কিংবা নিন্দায়
পাড়াপাড়শিরা হুল্লোড়ের হাট বসিয়ে লাঠালাঠি,
মাথা ফাটাফাটি করলেও সেদিকে আমার
লেশামাত্র নজর নেই।
তোমরা কি দ্যাখো নি কী করে নিমেষে
বিকল্প সৌরলোক, ভিন্ন চাঁদ, স্বতন্ত্র
তারাভরা নিশীথের আকাশ আমি তৈরি করি?
তোমাদের চোখে কি পড়ে নি আমার বানানো
সেই বাগিচা যা' আদম ও হাওয়ার উদ্যানের চেয়েও সুন্দর,
অথচ সেখানে নেই সবুজ সাপের হিস্‌হিসে পরামর্শ?
নিশ্চয়ই সেই বাগানে তোমরা দেখেছ
বেহেশ্‌তের হুরীদের অধিক রূপবতী তরুণীদের, যারা
তারায়-গড়া ময়ূরপঙ্খী নাও কুমারী জলে ভাসিয়ে
রওয়ানা হয় প্রেমোপাখ্যানময়
দ্বীপের উদ্দেশে। ঢেউয়ের তালে তালে দোলে তাদের স্তন,
তাদের উল্লসিত কেশে জলকণা চিক চিক করে। সমুদ্রতলে
সুলেমানী রত্ন ভাণ্ডারের চেয়েও ঐশ্বর্যময় খাজাঞ্চিখানা
নির্মাণ করেছি, এ-ও তোমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, আমার বিশ্বাস।
তোমরা কি অগ্রাহ্য করো আমার দাবি? আমাকে আজ
গোধূলি বেলায় প্রতারক অপবাদ দিয়ে
এই তমসাচ্ছন্ন, অবক্ষয়-স্পৃষ্ট নগরী থেকে
তাড়িয়ে দিতে চাও? এই তো আমি মেঘের
শাদা ঘোড়ায় সওয়ার, ঘোরাচ্ছি আঙুল
আর চতুর্দিকে অন্ধকারকে লজ্জা দিয়ে
শিশুর হাসির মতো ফুটে উঠছে আলো,
খরাপীড়িত নরনারীর পায়ের তলায় বয়ে যাচ্ছে

জলধারা গ্রামীণ কন্যাদের গীত ধ্বনির মতো-
তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? দ্যাখো, আমারই ইচ্ছায়
কীরকম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অজস্র গোলাপ
আবর্জনার স্তূপে, দুঃস্থ কবিয়াল
যুবরাজের ভঙ্গিতে তার সারিন্দায়
লাগাচ্ছে দিক-জাগানো নতুন সুর, জমির আল
মিশে যাচ্ছে স্বর্গগঙ্গায় এবং আততায়ীদের
ধারালো অস্ত্রগুলো মিলনমালা হয়ে দুলছে।
এখন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমার অস্তিত্ব
তরঙ্গিত নদীর মতো এক নাচ, ঘূর্ণমান
দরবেশের মতো আত্মহারা আর টাল সামলে
নিজের পায়ের দিকে তাকাতেই আমি কেমন পাথুরে স্তব্ধতা।

নিঝুম বৃষ্টির সুর

সাঁওতাল রমণীর মতো যে অন্ধকার
দিগন্তে স্তব্ধ,
তা' এখন শহরের ওপর খুব নীচু হ'য়ে
ঝুঁকে পড়েছে; ওর নিঃশ্বাস
অনুভব করি ত্বকে। থমথমে গুমোট-ছেঁড়া
হাওয়ায় ঈষৎ শৈত্য; শহরের চোখের পলক
না পড়তেই বাতাসের
প্রচণ্ড মাতলামি, নিমেষে হাজার হাজার
দরজা জানালা বন্ধ। আকাশ ফুটো করে
বৃষ্টি এল অগণিত ঘোড়সওয়ারের মতো আওয়াজে।

মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-তরবারির
ঝলসানি, কানফাটানো বাজের শব্দ!
একটানা বৃষ্টির সুর ঝরে শিশুপল্লীর ছাদে,
গোশালার টিনে, রাধাচূড়া গাছের পাতায়,
নিঝুম বৃষ্টির সুর ঝরে
হতশ্রী বস্তির খোলার ঘরে আর
শহরের উঁচকপালে এলাকায়,
ঘুমের ভেতরে, অবচেতন মনের খনিতে।
বৃষ্টির সুর ঝরে আমাদের ভালোবাসার ওপর,
আমাদের মিলন এবং হু হু বিচ্ছেদের ওপর।
আমাদের স্বপ্নেরা বৃষ্টির জালে আট্‌কা পড়ে
ছটফট করে চকচকে রূপালি মাছের মতো।
আমি আমার ছোট ঘরে বসে আছি
একা এবং নিশ্চুপ-
আমার মাথায় বৃষ্টির শব্দময় শব্দহীনতা আর
একটি হয়ে-উঠতে-চাওয়া কবিতার
অস্পষ্ট মেঘমল্লার এবং
তোমার স্মৃতির মোহন কম্পন।
তুমি অন্ধকার বারান্দায় একাকিনী বসে দেখছো
বৃষ্টি কোমল চুমো খাচ্ছে আম গাছের পাতার ঠোঁটে।
তোমার নিঃসঙ্গতাকে স্পর্শ করে
নিঝুম বৃষ্টির সুর। আমার শূন্য বিছানা
ভেলার মতো ভাসমান অথৈ বেদনায়।
তোমার এবং আমার
হাতে মাঝখানে জলজ দেয়াল। কে যেন
বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত পান করে চলেছে শ্রাবণের আরক।

যখন বৃষ্টি দেখি, তোমার প্রগাঢ় চোখের অশ্রুজল
মনে পড়ে আর তোমার চোখের জলে শ্রাবণধারা খুঁজে পাই।

নৌকা কাহিনী

কিছুক্ষণের জন্যে, এই ধরো চব্বিশ-ঘণ্টাব্যাপী, একটা জোয়ার
এসেছিল। লোকগুলো আনন্দ। টগবগে ছন্দোমায় কোনো কবিতা
যেমন মাতিয়ে রাখে সবাইকে, তেমনি। একটি নৌকা,
ছিপছিপে, ঔদার্যে অলংকৃত, জলে ভাসতে ভাসতে ওদে,
যারা তীরে দাঁড়িয়ে দূরে থেকে দেখছিল খেলাচ্ছলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকায় দোলা, বলে, “অনুপম সূর্যোদয়
দেখাব তোমাদের। তোমরা ভরাট গলায় জয়ধ্বনি দাও”।
নদীতীরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর মনের গহনে তখনো
সূর্যোদয় দেখার সাধ আড়মোরা ভাঙেনি। নৌকা
মানুষের নিঃস্পৃহতার ধূসর ধাক্কায় অনেকক্ষণ ঘুরপাক
খেলো মাঝ-নদীতে। তারপর জলকন্যার মতো দিলো ডুব।
প্রতিশ্রুতি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে মুক্তোর দ্যুতি ছড়ায়।

প্রতিটি নিঃশ্বাসে

বারান্দায় আহত লোকটা। তার অর্ধেক শরীর
বোদ্দুরে, অর্ধেক ন্যস্ত ছায়ায়; ঘুরে কোমলতা
প্রশ্রয় দিয়েছে তাকে। খোয়াবের অর্ধস্ফুট ভিড়
ঘিরে ধরে, সুপ্রাচীন কংকালেরা হিজিবিজি কথা

কেবলি বলতে থাকে স্বপ্নের ভেতর। অকস্মাৎ
জেগে ওঠে, এদিক ওদিক দেখে নেয় ভালো করে;
বেখাপ্পা দুপুর ছোরাহত মানুষের মতো কাত
হ'য়ে বিকেলের কাঁধে ঢলে পড়ে গৃহস্থের দোরে।
এ কেমন রাত আসে? ধূসর পথের ক্লান্ত ঠোঁটে
শিশির রক্তের রঙ ধরে; ঘরবাড়ি শীতে নয়
আতঙ্কে কম্পিত যেন। নিদ্রাছুট মানুষেরা ভয়
পেতে পেতে নিথর নিঃস্পন্দ হ'য়ে গেছে। অবিশ্বাসে
আচ্ছন্ন পাথুরে চোখ। কখন যে ফের জেগে ওঠে
মানবিক বোধ, এই প্রশ্ন কাঁপে প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

প্রতিদান

অমাবস্যা আমাকে নিত্যদিন গিলে খেতে চায়,
আমি তার গলায় চাঁদ ঝুলিয়ে দিই তড়িঘড়ি।
পোকামাকড় হরহামেশা আমরা শরীরে উৎপাত চালায়,
আমি ওদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকি।
মধ্যরাতে আমার ঘুমের নরম মাংসে
তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দেয় দুঃস্বপ্ন, আমি জাঁহাবাজ, কুৎসিত
স্বপ্নগুলোকে সুন্দর করে গড়ি।
কালবৈশাখী এক ঝটকায় উপড়ে ফেলে আমার ভালোবাসার
নিভৃত তাঁবু আমি দূরন্ত ঝড়ের উদ্দেশে
স্তোত্র রচনার প্রয়াসে কলম ধরি।
যারা মৈত্রীর মুখোশ এঁটে মুখে
আমাকে কাদায় ফেলে পা ছোড়ে জোরেশোরে,

আমি তাদের অপ্রস্তুত কপালে
চন্দনের ফুল এঁকে দিতে পছন্দ করি।

বন্দনীয়

আমার নিকটে এসে পুনরায় দূরে চলে গেলে।
যাবার সময় তুমি আমার কথার প্রতি কান
দাওনি, অথচ আমি আলো-আঁধারির কণ্ঠস্বরে
হৃদয়ের কিছু কথা তোমাকেই বলতে চেয়েছি।
আমার দু'হাতে কারা হাতকড়া দিয়েছে পরিয়ে,
আমি হাঁটলেই ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে লোহার শেকল
বার বার-এই অজুহাতে তুমি পরিহার করো
আমাকে এখন, জানি কারাগারে জমে না প্রণয়।
তবুও তোমাকে নিত্য গোলাপ পাঠাই, ভিলানেল
লিখে যাই তোমার উদ্দেশ্যে তাজা হৃদরক্ত দিয়ে।
প্রতিষ্ঠালোলুপ সব সমাজসেবক স্তব করে
শাসকের; আমি আজও তোমাকেই বন্দনীয় মানি।

বন্ধুবরেষু

বেশ কিছু দিন থেকে তোমার শরীর ভালো নেই,
বলা যায়, মনও ভালো নেই। শীতের রোদ্দুরে একা
বসে থাকো চুপচাপ বিষণ্ন ধ্যানীর মতো, চোখে
ভেসে ওঠে কবেকার শূন্য মাঠ, চারু পদছাপ।

ঈষৎ অক্ষম বটে, অসহায় পদচারণায়;
খাতার সকল পাতা থেকে যায় অক্ষরবিহীন।
তোমার মননে পক্ষাঘাতের কামড় নেই, টান
আছে ঠিক আগেকার মতো রবীন্দ্রনাথের গানে।
কখনো ছিলে না সঙ্ঘে, একলা সর্বদা নির্বাচিত
বান্ধবমণ্ডলে, গাম্ভীর্যের অন্তরালে হাস্যরস
বুঝি বা লুকানো থাকে, ঝর্ণা হয়ে ঝরে মাঝে-মাঝে;
দেখলে তোমার মুখ হৃদয়ে রোদ্দুর কথা বলে।
আজ প্রাতঃভ্রমণে বেরুনো দায়, ঠায় বসে থাকা,
নিজের সঙ্গেই চলে বিভিন্ন আলাপ, কখনো বা
শব্দাবলী খুনসুটি করে অসাড় হাতে সাথে,
তোমার মনোজ হংস উড়ে যায় কোন সে মানস সরোবরে।

বাঁচো, তুমি বাঁচো

বাঁচো, তুমি বাঁচো ধীরে স্থির অনাবিল বেঁচে থাকো।
এক বুক রৌদ্রছায়া নিয়ে বাঁচো; কাকে
বলে বাঁচা, এনিয়ে খামোকা যুক্তিতর্ক
করো না কখনো, বাঁচো, তুমি শুধু বাঁচো।
এইতো তোমাকে ছুঁয়ে যায় হাওয়া, পাখি
শোনায় কত যে গান, জ্যোৎস্না তোমার পায়ের কাছে
কোমল লুটিয়ে পড়ে, গাছের নিবিড় পাতাগুলি
খোলাখুলি তোমাকে জপায় রোজ, ‘বাঁচো, তুমি বাঁচো’।
ম্লান, ছেঁড়া বাচাল পোস্টার পথে পড়ে আছে, শিশু
বখিল উঠানে খিলখিল হাসে খেলনাবিহীন;

বারান্দায় একজন তরুণী শ্রাবণ-কালো চুলে
চালায় চিরুনি চিরায়ত ডৌলে-চোখ ভরে দ্যাখো।
জ্বর ছেড়ে গেছে, মুখ নেই তেতো স্বাদ, ফল খাও, কাশিটাও
তেমন নাছোড় নয়। রোগ শোক সত্ত্বেও গভীর তুমি বাঁচো।
মেঘের ওপারে নয়, এখানেই কোথাও তোমার জন্যে কেউ
প্রতীক্ষায় আছে, তার আর কবিতার জন্যে বাঁচো, তুমি বেঁচে থাকো।

বাগান

সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে
কয়েকটি চারাগাছের দিকে তাকিয়ে তার
স্বপ্নের কথা বলছিল, 'যদি কোনো দিন
আমার নিজের বাড়ি হয়, তাহ'লে আমার
শোবার ঘরের জানালার
কিছু দূরে থাকবে হাস্নাহেনার গাছ,
ড্রইং রুমের দেয়াল ঘেঁষে
বেড়ে উঠতে দেবো বেলি ফুলের ঝাড়
আর গেটের সামনে
ফুল ফোটাবে একটি বকুল গাছ'।
অথচ ঘুণাক্ষরে তার মনেই হয় নি যে,
সে নিজেই একটি বাগান। দেখি,
ওর স্বপ্নের ওপর শুধু
চিক চিক করছে দুপুরের রোদ।

বিতর্ক

থাকুক না; থাকলে দোষ কী? আজ ওদের হটাতে
করা সভা ডেকে
করবে ঘোষণা লাগাতার হরতাল? বলো, কারা
মানববন্ধনে মেতে চাঁদ আর চন্দ্রমল্লিকাকে
কবিতার খাস জমিনের চতুঃসীমা
থেকে দেবেনির্বাসন? না, ওরা থাকবে নিজ নিজ
জায়গায় অটুট। কারো কোনো ক্ষতি নেই;
কবিতার বুকে নিত্য ফুটবে গোলাপ আর দুলবে দোয়েল।
কবিতা কি ধুলোবালি থেকে ইস্ত্রি করা
কাপড় বাঁচিয়ে খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে
অশোক ফুটিয়ে হেঁটে যাবে অথবা রুমালে নাক ঢেকে
এঁদো বস্তি পার হবে মখমলী চটি পায়ে? যদি
মানুষের বসতিতে হঠাৎ আগুন আগে, তবে কবিতা কি
মাউথ অর্গানে সুর তুলে আর্তনাদ মুছে দেবে?
যদি কোনো চিত্রকল্পে বেজে ওঠে কংকালের হাড়,
উপমায় ভীষণ শীতার্ত, খাদ্যহীন, তাপহীন
নারী আর শিশুদের নীল মুখ ভেসে ওঠে, তবে
ঘোর নান্দনিক কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত
হবে কি ধিক্কার? এ প্রশ্ন তুলে যারা
পথে হাঁটে, মিছিলে দুর্বার ছোটে, তারা
উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকবে না। রোদ্দুরে মন্দিরা বাজে,
নতুন আঙ্গিকে ওরা হয়ে ওঠে দীপ্ত মানবিক।

ভালোবাসর অর্থ

সারা পথে ধুলো ছিল, কাঁটার
শাসন ছিল, কাঁকরের বিরূপতা সইতে
হয়েছে ঢের। জানতাম না পা দুটোকে রক্তাক্ত করে
কায়ক্লেশে এখানে পৌঁছে
দেখতে পাব সরোবরের উদ্ভাসন। এখানে আসার
কথা ছিল না, তবুও এলাম।
সরোবরের টলটলে জলে মুখ রেখে
তৃষ্ণা মেটাই ব্যাধের বিপদে থেকে ছুটে-আসা
বনের প্রাণীর মতো। দূরে তাকিয়ে দেখি,
তুমি দিগন্তের মহিমা থেকে বেরিয়ে আসছো;
তোমার শাড়ির রঙের বিচ্ছুরণ কলাপ মেলে আকাশে,
আমার আকাঙ্ক্ষা সুদূরপ্রসারী।
যখন নত আমি তোমার মুখের উপর,
তুমি রহস্যের ভাস্কর্য।
তোমার স্তনের নগ্নতাকে চুমো খাই যখন, তখন ধানের শীষ
ফোটে গানের গানে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখি
শিঁস দেয়, কৃষকের কুটির দুলে ওঠে বসন্ত বাহারের সুরে
এবং ছিপছিপে নৌকো তীর ছেড়ে এগোতে তাকে জল চিরে।
তোমার নাকে ক’ ফোঁটা ঘাম, যেন ভোরের
পাতায় জমে থাকে শিশিরবিন্দু। তোমার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ
আমাকে বানায় মাতাল তরণী, অপ্রতিরোধ্য
কামনার হাত চেপে ধরি। কী কথা বলতে গিয়ে বোবার
অস্বস্তি রাখি ঢেকে; বিষণ্ন, রক্তচক্ষু কোকিল
নীরবতা পোহায় নগ্ন পাতার আড়ালে।

আমার হৃদয়ে প্রেম মজুরের কর্মচঞ্চল
রগের মতো দপদপ করে। জীবনের
সঙ্গে আমার গভীর দৃষ্টি বিনিময় হলো,
যখন তোমার মধ্যে দেখলাম পবিত্র অগ্নিশিখা আর
সেই মুহূর্তে তুমি আমাকে এনে দিলে একরাশ পতঙ্গের
ভস্মরাশি, যাতে ভালোবাসার অর্থ বুঝতে ভুল না হয় আমার।

মিনতি

তুমি কি এসেছ ফিরে? তুমিতো জানোই বহুদিন
ধরে আমি নীরেট বধির আর দু'চোখ আমার
জ্যোতিহীন। প্রত্যহ কে এক পাখির সুরের আড়ালে
বলে যায়, ধৈর্য ধরো, প্রতীক্ষা শিখতে হয় তাকে,
যে চায় প্রকৃত রূপ দেখে নিতে অন্তরের চোখে।
বৃশ্চিক দংশন করলে নড়বে না, বেনো জলে
বেবাক তৈজসপত্র ভেসে গেলে শান্ত থাকা চাই।
সবুরে জ্বলবে বাতি ছন্নছাড়া অন্ধকার ঘরে'।
কত আর ধৈর্য ধরি? পক্ষী-পর্যবেক্ষকের মতো
চেয়ে থাকি সর্বক্ষণ দৃষ্টিহীন। প্রতীক্ষার শেষে
আসবে তারার মতো শব্দস্রোত ভেবে কী নিশ্চুপ
বসে আছি; অজস্র বল্মীক এসে আমাকে নিশ্চিত
দেবে ঢেকে। যত শীঘ্র পারো ফিরে এসো এ নিবাসে,
আমার চোখের জ্যোতি আবার স্থাপন করো আজ।

যদি আরো কিছুকাল

যদি আরো কিছুকাল পৃথিবীর ধুলোবালি, জল
আমার সত্তায় লাগে, বাতাস রূপালি
চুলগুলি নিয়ে খেলা করে নিরিবিলি
আরো কিছুকাল, তবে এমন কী ক্ষতি হবে কার?
এইতো দেখছি ফুল তার যৌবনের আভা নিয়ে
ফুটে আছে, ডালে বসে পাখি চমৎকার
শিস দিয়ে বিকালকে বেশি বৈকালিক
ক'রে তোলে, বুঝি বা ঈষৎ ঈশ্বরিত!
মোড়ায় আছে বসে মা আমার বৈধব্যের শুভ্র
স্তব্ধতায়, স্মৃতিগুলি যেন মেঘমালা থেকে নামে
এবং সাঁতার কাটে তাঁর পায়ের কিনারে। এই
দেখা আরো কিছুকাল থাকুক না হয়।
সারা রাত অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে ঘুমের ওপর,
সারা রাত বৃষ্টি পড়ে স্বপ্নের ভেতর,
মায়াবি ঘুঙুর বাজে চরাচরে, শুনে ফেলি অপার বিস্ময়ে-
নামুক এমন বর্ষা বার বার হৃদয়ে আমার।

যে অদৃশ্য চাঁদ

বেলা তো অনেক হলো। এরই মধ্যে গুছিয়ে ফেলার
কথা ছিল সব কিছু। অথচ কেমন
অগোছালো পড়ে আছে সংসার এবং
কবিতার ঘর, যেন কোনো

দুষ্ট বালকের দস্যিপনায় পাখির বাসা খুব
তছনছ হয়ে আছে
বিষণ্ন ধুলোয় এক কোণে। পথচারী
উপেক্ষার কিছু ছাই ছড়িয়ে গন্তব্যে চলে যায়।
আশা ছিল, যেটুকু হায়াত আছে বাকি,
বিকেলের রোদ, জ্যোৎস্না, পাখিদের ওড়াউড়ি আর
গাছ গাছালির সবুজাভা, মেঘ দেখে
বই পড়ে, শিশুদের ছোটাছুটি, আপনজনের
কথা উপভোগ করে, কবিতার অন্তঃপুরে ব'সে
নিশ্চিন্ত কাটিয়ে দেবো। কিন্তু আমি আজ
হঠাৎ লুণ্ঠিত মানুষের মতো নিঃস্ব, প্রায় নগ্ন,
বাইরে প্রচণ্ড শীতে বৃষ্টিতে কাঁপছি হি হি এক
অবোধ শিশুর হাত ধরে। হায়, আমার ভুরুর মাঝখানে
যে অদৃশ্য চাঁদ আছে তা-ও কি আখেরে নিভে যাবে?

রক্ষাকবচ

মধ্যদুপুরে সতেজ যুবক দুর্ঘটনায়
রাস্তায় পড়ে বেশ বিব্রত। হাতে ছিল তার
নাদুস নুদুস বঙ্গীয় কিছু হালের থ্রিলার।
থ্রিলার সহায়, একটি আঁচড়ও লাগে নি শরীরে।
গীতবিতান কি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তার
হতো না কি বলে যথেষ্ট এক রক্ষাকবচ?

রবীন্দ্রনাথের জন্যে

যখন অধ্যাপকের জিভের ডগায়
তোমার কবিতাবলী ভীষণ চর্চিত হ'তে থাকে,
তখন আমার কেউ নও তুমি হে রবীন্দ্রনাথ।
যখন ঘোড়েল রাজনীতিবিদ মাতে
মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে
তোমার প্রবল নাম সংকীর্তনে
তোমার রচনাবলী না পড়েই, তখন তোমাকে
চিনি না এবং
যখন তোমার গান সরকারি আসরে অলঙ্কার
হয়ে বাজে উদাসীন কানে, তখনও আমার
কেউ নও তুমি।
যখন নিভৃতে দেখি তুমি পদ্মাতীরে হেঁটে যাও
আদিগন্ত সরল জ্যোৎস্নায় গীতিবিতানের স্মৃতিময়তায়,
তখন তোমার দিকে বিস্মিত তাকাই,
তখন তোমার দিকে তাকাই,
তখনই আমার তুমি, একান্ত আমার,
ভেজা মাটি, স্বর্ণ রেণু, সমস্ত আকাশ যেন তোমার হৃদয়,
আমার অন্তর জুড়ে তোমারই অমর্ত্য পদধ্বনি।

শব্দচেতনা

কোনো লুকোছাপা নয়, এর দরকার
আছে বলে মনে করি না।

শব্দ নিয়ে ছ্যাবলামি আমার
ধাতে নেই,-এই শাদা কথাটা আমাকে
সরাসরি বলতেই হচ্ছে। না বললেও চলে বটে,
যা ঘটে ঘটুক, বলে ফেলাটাই ভালো।
আত্মহত্যার বদলে খুদকুশি শব্দটি যদি
বসিয়ে দিই কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা না বলে
বলি সওতেলা ভাই, তাহ'লে কি
আমাকে কেউ দিনদুপুরে হাতকড়া পরিয়ে দেবে?
কারগারের পরিবর্তে জিন্দানখানা
অথবা পরম বান্ধবের জায়গায় জিগরি দোস্ত
ব্যবহার করি, তবে কি
বঙ্গীয় শব্দকোষ মানহানি-মামলা করবে আমার বিরুদ্ধে?
কখনো যদি মহাফেজখানায় বসে
খোদার বদলে ঈশ্বর এবং পানির বদলে
জল উচ্চরণ করি, তাহলে কি বাজ পড়বে
কারো মাথায়? যদি মুখ থেকে আধা ডজন পুষ্পার্ঘ্য
আর এক ডজন প্রণাম অথবা নমস্কার
বেরিয়ে পড়ে তবে কি নাকে খৎ দিতে হবে সাতবার?
আপাতত কিছু শব্দ প্রজাপতির মতো
উড়ে এসে বসছে আমার নাকে, কানে,
ওষ্ঠে আর খোলা বুকের পশমে; আমার
চোখ মুদে আসছে। প্রজাপতিগুলো এক ফাঁকে
ভ্রমর হ'য়ে গুঞ্জরণে
আমার অবসরকে বানিয়ে তুলছে
এক চমৎকার খেলা এবং কনকনে হাওয়ায়
স্পন্দিত ফুল ফোটার বেলা।

শব্দশব

বসে, শুয়ে দাঁড়িয়ে,-কিছুতেই
না আমার সুখ, না স্বস্তি।
রেস্তোরাঁয় চিকেন কাটলেট অর্ডার দিয়ে অথবা বাসস্টপে
দাঁড়িয়ে, পার্কের বেঞ্চিতে বসে গাছ থেকে
পাতা খসে-যাওয়া কিংবা
ঝালমুড়িঅলার তৎপরতা দেখতে দেখতে
আমি ছটফট করি।
মনে আমার চরকি; চাদ্দিকে এই
ঘোরাঘুরি আমার সময়কে খায়, আমাকেও
খায়। সুতোহীন এক রঙিন ঘুড়ি
আকাশে দুলতে দুলতে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
আর তাকে ধরার জন্যে ছুটতে থাকি অবুঝ
বালকের মতো। সবুজ ঘাসে লুকানো পাথরে হোঁচট খেয়ে
আমার ঠোঁট থেকে ঝরে রক্ত। তবুও
হুঁশ নেই, চলে হাত বাড়িয়ে অবিরাম ছোটা।
না বিত্তের ঝলসানি, না রমনীয় ভালোবাসা,
শুধু এক শব্দতৃষ্ণা আমাকে অষ্টপ্রহর
তাড়িয়ে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিক।
হাওয়া, গাছের পাতা, রোদের টুকরো
আর পাখির পালক থেকে শব্দ পাওয়ার
আশায় এই বয়সেও ভাষাহীন আমার তুমুল ছটফটানি।
হঠাৎ কিছু শব্দ পেয়েও যাই, অথচ শব্দগুলোকে
ঠিকমতো সাজাতে গিয়ে
পণ্ড করে ফেলি বিন্যাসের আলপনা আর
প্রিয়তমা শবের পাশে বসে উস্‌কো খুস্‌কো।

শান্তি কি হরিণ

শান্তি কি হরিণ হয়ে ঘুমাচ্ছিল এখানে কোথাও? ‘স্বপ্ন দাও’
বলে সে কি ঘুমের ভেতর অন্তরীণ
উঠেছিল নড়ে? তার শরীরে আঁচড়
পড়ে এলোমেলো, জেগে বিখ্যাত দু’চোখ
মেলে খোঁজে ঝিলের ঝলক ত্রস্ত তাকায় অদূরে,
দেখে নিতে চায় সন্ত্রাসের নেশায় মাতাল কোনো
ব্যাধের নিশানা তীক্ষ্ণ হয়ে আছে কি না।
অথচ বাজায় বীণা গাছ, প্রজাপতিদের নাচ
পাতায় পাতায়; তবু ভয় জেগে রয়
স্পন্দিত হৃদয় জুড়ে। কত ভালো হয়, যদি গুপ্ত
নিষাদের পায়ের তলার মাটি দ্রুত সরে যায়,
দেবতার হাত নেমে আসে অকস্মাৎ মেঘ থেকে।

শুদ্ধ হতে চাই

আহ্ কতকাল পর দেখা। এখন তোমার কোনো
খবর রাখি না বন্ধু, এ লজ্জা আমার। কী করে যে
তোমাকে ভুলেছিলাম এতদিন, অথচ দিন ছিল
আমরা দু’জন দিব্য একই বিছানায় ঘুমোতাম
গলাগলি, দাড়ি কামাতাম একই ব্লেডে। পরস্পর বলাবলি
করতাম নিজ নিজ স্বপ্ন কথা। আহ্ কী সুন্দর
স্বপ্নই না দেখতাম আমরা তখন।
সেসব স্মরণ করে বুকের ভেতর হু হু হাওয়া বয়ে যায়।

কী-যে হলো, সঙ্গের সংঘর্ষে বাচালের হুমকিতে,
সঙ্গীতের ভ্রষ্টাচারে তুমি দূরে, খুব বেশি দূরে
সরে গেলে; আমাকে গিলতে হলো নোংরা।
বার বার বিসমিষা পাক খায়, ভেদবমি হ'য়েও নিস্তার
নেই, দ্যাখো আজ আমি গুলি-খাওয়া বাঘের মতোই
আপন গুহায় শুয়ে ক্ষত চেটে নিরাময়
চাই আগোচরে, ভুলে যেতে চাই সেই আত্মঘাতী
তমসার সরীসৃপ-স্মৃতি। হা করি, কী নিঃস্ব আমি।
যাক গে, ভালোই হ'লো, হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা
এই অবেলায়; হয়তো আমি
নিজেরই অজ্ঞাতসারে তোমাকে খুঁজেছি
অন্তরের বাহিরে সর্বক্ষণ। দ্রষ্টা তুমি, এ গরিব
ভিখিনীকে তোমার ভেতরে টেনে নাও,
হৃদয়ে রঙিন পাখি পোষার অবাধ অধিকার
দাও আর তোমার আশ্চর্য সব স্বপ্ন জাগাও আমার চোখে,
আমিও তোমারই মতো শুদ্ধ হতে চাই।

শ্বাসকষ্ট

হৈ হৈ হাটে কিছু কেনাকাটা কিংবা বেচা
ছিল না আমার মনে। তবু
ঘেঁষাঘেষি, পা মাড়ানো, গুঁতোগুঁতি আমাকে বিব্রত,
বিমর্ষ, বিপন্ন করে। কেউ কেউ রক্তের তিলক
কপালে পরিয়ে দেয়, কেউ বা পাঠায়
লাঠির অরণ্যে, হামেশাই গালি গালাজের বানে

ভাসি, আর কোমরবন্ধের নিচে খুশি
মেরে প্রতিপক্ষ সুখে পানসি ভাসায় নদীবক্ষে পাল তুলে।
খুব সাবধানে তাঁবু খাটিয়ে নিজেকে নিরালায়
লুকিয়ে রাখার সাধনায় মগ্ন হই, ভালো থাকি
সূর্যমুখী-ছাওয়া মাঠে, গাছপালা, পাখিদের জলসায়, দিঘির স্নেহের
স্পর্শ নিয়ে, মাঝে মাঝে সাঁঝে দেখি একটি তরুণী
খোঁপা থেকে ফুল খুলে ভাষায় দিঘির জলে, চলে
যায় দিগন্তের দিকে। অন্য কারো পদচ্ছাপ দেখি না কখনো।
অকস্মাৎ দুরন্ত ঝঞ্ঝায় এক ঝটকায় সুরক্ষিত
তাঁবু উড়ে যায়, খুঁটিগুলি শূন্যে ওড়ে,
দেবোপম উলঙ্গতা নিয়ে হি হি কাঁপি,
জলজ রাক্ষস তীক্ষ্ণ দাঁত দেখায়, কাচের মতো
ভাঙে প্রতিবোধ, চতুর্দিকে পুনরায়
হট্টরোল জেগে ওঠে; শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে থাকে।

শ্যামলীর গালিব

ইয়ার বক্সির মজলিশ থেকে সবেমাত্র তিনি
নেমেছেন ধূসর রাস্তায়; তার কণ্ঠনালী ব্যেপে
সদ্য কিছু গজল পাঠের স্মৃতি স্তব্ধতা পোহায়।
সুরা মেঘময় করে তাকে; নক্‌শাদার পাল্কি নয়,
ধোঁয়া ছেড়ে বেবী ট্যাক্সি কাছে আসে প্রতীকের রূপে।
আত্মা আছে কিংবা নেই, এই তর্ক মুলতুবি রেখে
গলিতে ঢোকেন ছায়া-প্রায়। কে যেন জানালো তাকে,
‘এই মির্জা, দ্যাখো কত মোহর তোমার পিরহানে

লেগে আছে জ্বলজ্বলে’। শায়ের ভ্রূক্ষেপহীন, একা
ঘরে ফিরে ঝাড়লেন নিজের কামিজ, লহমায়
জামার আস্তিনে গজলের সুর বাজে; রাত্রি তার
ওপর নিছক নারী, ঝুঁকে-থাকা। তিনি উদাসীন,
নীরব থাকেন চেয়ে দূর নক্ষত্রের জলসায়।
জানালার পাশের পেয়ারা গাছ, মসৃণ বেড়াল,
নিদ্রাতুর ঘরদোর জানে না যন্ত্রণা তার আর
অন্তর্গত খর ক্ষরণের রক্তচ্ছাপ প্রকাশিত
নয় বটে। ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রী-র দিকে কিছুক্ষণ চোখ
রাখেন, শোনেন রুক্ষ, বিরান জমির হাহাকার
আর কোনো এক ধ্বংসস্তূপের নাছোড় স্মৃতি তাকে
বিচলিত করে খুব; পাঁজরের খাঁচায় কে পাখি
কাঁদে? বুঝি শ্যামা বুলবুলিকে না পেয়ে কাছে ধারে
দুঃখ নয়; নৈশ হাওয়া চেটে নেয় গীতসুধাময়
কসবির আত্মার আতর, নিশীথের প্ররোচনা
বড় তীব্র; গোলাপ বাগানে ঘোরে কবির কংকাল।
ভোরের আবীর ঝরে নিরিবিলি শ্যামলীর সুপ্ত
গালিবের সত্তাময়। খোঁয়ারির তীরে জেগে উঠে
তিনি নিশীথের কাছে পাওয়া গজলের রাঙা ওড়না
খোঁজেন হাতের কাছে। ইজারবন্দের গিট খুলে
খুলে পদাবলী পেয়ে যান, কিছু চুম্‌কি-খসা ওড়না
ওড়ে উল্লসিত রাধাচূড়া গাছে, বাংলার আকাশে।

সর্বত্র মানুষ

আদিগন্ত প্রসারিত মাঠ,
উদার আকাশ
আর হৃদয়ের সন্দীপণ
আমাকে দিয়েছে পাঠ স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে গমনের,
মহানুভবের স্পর্শে মহাশ্মশানেও
বসন্তের বৃক্ষরোপণের।
পূণ্যলোভীদের ক্রূর চিৎকার, ধ্বংসের
বীভৎস উৎসব পণ্ড করে
সৌন্দর্যের মহিমার দীপ্র সম্মিলন
এবং জখম করে কবিতার গ্রীবা
দিবানিশি। সর্বত্র মানুষ আজ ভয়ানক ভীত,
হঠাৎ আগুন-লাগা উড়োজাহাজের যাত্রী যেন।

সামনে পা বাড়াবার পালা

গোধূলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে
কে যেন ডাকে আমাকে, বলে-
আর নয় নিষ্ক্রিয়তার মদে চুর হ'য়ে
বসে-থাকা,
আর নয়, আফিমে বুঁদ হ'য়ে ঝিমুনি।
এবার শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে
উঠে দাঁড়াও; স্থবিরতার পাথর হটিয়ে
এবার সামনে পা বাড়াবার পালা।
যারা আলো-তাড়ানো অন্ধকারের

বিরুদ্ধে লড়ছে,
যারা আগাছাগুলো উপড়ে ফেলে মানুষ মানুষে
সম্প্রীতির সাঁকো গড়ছে, যারা
আগামী শতাব্দীর দিকে মুখ রেখে
করছে নতুন সভ্যতার নান্দীপাঠ,
যারা চাষ করছে মানবতার পতিত মাঠ,
এসো আমরা সবাই
হাত লাগাই তাদের কাজে। এসো আমরা
প্রতিক্রিয়ার শ্যাওলা-ছাওয়া ভিত কাঁপিয়ে গান গাই।
সময়ের ঘাড় ধরে যারা নিয়ে যেতে চাইছে
প্রস্তর যুগে, এসো আমরা আমাদের দিকে ধেয়ে-আসা
সেসব পাথর ফেরত পাঠাই
চির স্থবিরতার দিকে। আমাদের কণ্ঠে
প্রশ্রয় দেবো না পরাজয়ের আঁধার-আক্রান্ত ধুসরতাকে,
আমাদের গীতধারায় আশ্রয় পাক জয়ধ্বনি।
ওরে তোরা সব জয়ধ্বনি কর বলে আমরা
এগিয়ে যাবো, এবার আমাদের সামনে পা বাড়াবার পালা।

সে লিখবে বলে

সে লিখবে বলে বসে আছে নির্মল সুফীর মতো
গভীর রাত্তিরে। চৌদিকের চেঁচামেচি গেছে থেমে
অনেক আগেই, ক্রুশ হ'য়ে প্রকাশিত তার ব্রত
অন্তরালে; সে লিখবে বলে আকাশ এসেছে নেমে
ছিটিয়ে নক্ষত্র কিছু। গাছপালা জানায় কুর্নিশ,

নিশীথের পক্ষীকুল ডানা থেকে ঘুম ঝেড়ে ঝুড়ে
জুড়ে দেয় গান, সে লিখবে বলে অলীকে উষ্ণীষ
মাথায় জ্বলছে তার, গূঢ় মন্ত্রধ্বনি জাগে মেধা জুড়ে।
ধ্যান মানে এক ধরনের যাদুভাষ্য, জন্মান্তর
বলা চলে, সে তার জানে বলেই প্রতীক্ষা করে খুব
ধৈর্য ধরে বিভিন্ন প্রহরে; যদি কোনোদিন ভুল
হয়ে যায় তার আরাধনায় বিভ্রমে সে প্রথম
অনুতাপে আরো বেশি সত্তার গভীরে দেয় ডুব,
অনন্তর ভেসে ওঠে হাতে নিয়ে অনন্তের ফুল।

স্বপ্নগুলো অবিন্যস্ত টেবিলে

স্বপ্নগুলো অবিন্যস্ত টেবিলে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না;
জ্যোৎস্নায় উড়ে এসে পড়ে
পোড়া ঘরের ছাই। ধুলোবালি খিলখিলিয়ে হেসে
ঢেকে দেয় তাকে, যে সবেমাত্র তার
স্বপ্নগুলোকে গুছিয়ে রাখছিল চায়ের পেয়ালায়;
সে এখন পুরনো কালের বিকৃত মূর্তির মতো।
এখানে প্রতি মিনিটে জন্ম নিচ্ছে হাজার হাজার
প্রেত, লহমায় বেড়ে উঠে গিলে ফেলছে
ঘড়ির মিনিট এবং সেকেন্ডের কাঁটাগুলো।
সময় এখানে ভারি পাথরের মতো, প্রেতবাহিনী
হাতে গোণা কয়েকটি প্রকৃত মানুষকে
ঘরছাড়া করে ঠা ঠা রোদ্দুরে
বজ্রপাতের দরনে হাসছে। ওদের মুখ-গহ্বর থেকে

গলগল করে বেরোয় রক্ত।
লোকগুলো প্রেতবাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায় মহা আহলাদে,
জুড়ে দেয় খোশগল্প, কী এক
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওরা একটু-একটু করে
প্রেত-প্রেত হ'য়ে উঠছে খেদহীন। রাতের
তৃতীয় প্রহরে তাড়া-খাওয়া কবিগণ ভয়ার্ত
ভাঙা গলায় আর্তনাদ করছেন
তাঁদের পাণ্ডুলিপিসমূহ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বলে নয়,
নাগরিকদের মুখগুলো ক্রমাগত নিজস্ব
মানুষের চামড়া ত্যাগ করে
বিচিত্র জীবজন্তুর রূপ ধারণ করছে বলে।
অবিন্যস্ত টেবিলে স্বপ্নগুলো পেরেকময় মাথার
দুঃস্বপ্নের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিচ্ছে। স্বপ্নচারীর
সারা শরীরে পেরেক গাঁথা, শুধু চোখ দুটো
জলপায়রার পালকের স্পর্শ পাওয়ার আশায় জাগ্রত, তৃষিত।

হরিনাথ সরকার বলছেন

আমার বসতবাড়ি, পুঁইমাচা, উঠোন, ইঁদারা
আমার দু'চোখ থেকে ওরা
মুছে দিতে চায়; ভরদুপুরে পুকুরে নিত্যদিন
জুড়িয়েছি শরীর, এ পথে হেঁটে গিয়েছি বিকেলে হাটে, প্রাণ
ভরে কথা বলে কাটিয়েছি কত বেলা
কাশেম মহিম আর মজিদের সঙ্গে। কোনোদিন
শুনেছি বাউল গান, ভেসে গেছি মুর্শিদি, কীর্তনে। ওরা আজ

আমার স্মৃতিকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে
হো হো হেসে ওঠে,
ওদের পায়ের নিজে আমার স্বপ্নেরা বড় আর্তনাদে করে।
তুলসীতলায় সাঁঝে দীপহীন স্তব্ধতা শীতল
দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে, নাটমন্দিরের ছাই
হাওয়ার, হৃদয়ে ওড়ে! সন্ধ্যার আহ্নিকে
এখন বসে না মন। সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে
সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াই সারাক্ষণ
আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে একমুঠো চিড়েগুড় খেয়ে, অতি
সন্তর্পণে ছায়া হয়ে হেঁটে যাই, ভিখিরির মতো পুঁজিহীন
একটু আশ্রয় খুঁজে সদাশয় গেরস্তের কাছে।
ও হরি, হে আল্লাহ, বলো প্রভু দয়াময়
আমার দেশের মাটি, ধুলিকণা আলো-হাওয়া, জল
কেন আজ এমন নিষিদ্ধ হবে আমারই সংসারে?
তোমার দুনিয়া, দীনবন্ধু, সমকালে
কেন এত ছোট মনে হয়?
তবে কি আমাকে শেষে, হায়,
নিজ চোখে দেখে যেতে হবে আত্মজার লুণ্ঠির সম্ভ্রম আর
নিঃশব্দে সাজাতে হবে আমার নিজেরই গুপ্ত চিতা?

হেঁটে যাই

আমার দু'হাতে কিছু নেই, তবু কেন
লোকে বলে-প্রহরে প্রহরে
পায়রা ওড়াই আমি, নিষ্পত্র গাছের জীর্ণ ডালে

বসাই রঙিন ফুল, খটখটে তিরিক্ষি খরায় রিম ঝিম
বৃষ্টি আনি নির্মেষ আকাশ থেকে আর
মাঝ রাতে বানাই অভ্রের ঘর শূন্যের মাঝার?
বাকপটু নই,
জিহ্বায় জড়তা ঝুঁকে থাকে সর্বক্ষণ, তবু কেন অক্ষরেরা
যখন তখন
ভ্রমের মতো তোলে গুঞ্জরণ মাথার ভেতরে,
বেরিয়ে আসতে চায় হুড়মুড় করে,
যেমন মুরগির ছানা, দর্বা খুলে দিলে পর ভোরে?
যখন একাকী হাঁটি ফুটপাতে, আমার উপর
ঝরে মুঠো মুঠো রেণু। বিস্ময়ে তাকাই
এদিক ওদিক, কেউ নেই আশেপাশে,
বুকের ভেতর নিয়ে অচিন সুরভি হেঁটে যাই শৈশব স্মৃতির দিকে।

১৪০০ সালের সূচনায়

জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে সারারাত সহবাস করে
বেদনা ভুলতে গিয়ে আরো বেশি বেদনার্ত হই।
১৪০০ সালের আশা সত্তাময় মেখে নিতে চেয়ে
ক্রামগত বুনো অন্ধকারে ডুবে যাই।
ক'দিন দু'চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, চর্তুদিকে বিভীষিকা
নানান মুখোশ পরে নাচ জুড়ে দেয়, অন্ধকারে
আমার একান্ত পাশে মৃত্যু শুয়ে তাকে,
হিয়ায়িত মিসাইল যেন।
হায়, সোমালিয়ায় মরছে কারা? মানুষ, মানুষ।

হায়, বসনিয়ায় মরছে কারা? মানুষ, মানুষ।
হায়, বসনিয়ায় ধর্ষিতা কারা? মায়েরা, বোনেরা।
বোম্বে, আর দিল্লী নগরীতে খুন হলো কারা? মানুষ, মানুষ।
ভোলায় আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরেছিল কারা? মানুষ, মানুষ।
প্রচ্ছন্ন মানিকগঞ্জে ধর্ষিতা হয়েছে কারা? মায়েরা বোনেরা।
সেখানে লুণ্ঠিত কারা? মানুষ, মানুষ।
এখানে লুণ্ঠিত কারা? মানুষ, মানুষ।
'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়'-
মানবতা প্রায়শই ব্যধভূমিতে চলেছে, হায়।
মৃত্যু প্রতিদিন খবরের কাগজে নিজের মুখ
পাখি-ডাকা সকালে দেখতে পেয়ে নিজেই আঁৎকে ওঠে খুব;
তবু মৃত্যু নিজেকে সাজিয়ে রাখে কম্পিউটারের
ঝকঝকে হরফে এবং বিজ্ঞাপিত হয় ভাঙনপ্রবণ বিশ্বময়।
আমরা কি মৃত্যুর ফরমাশ খেটে নিত্যদিন মনুষ্যত্ব
শ্মশানে ও গোরস্থানে ফেলে রেখে মানুষের প্রাণ
লুটে নেবে? ১৪০০ সালের সূচনায় বিশ্ববাসী
এসো আজ আমরা সবাই হৃদয়ের গানে গানে
গোধূলির মেঘ থেকে রক্তচিহ্ন আর ষড়যন্ত্রকারীদের
কালো খাতা থেকে সব আতঙ্কের নকশা মুছে ফেলি।
চারণ কবিরা সুরে দশ দিগন্তে রটিয়ে দিন-
'সকল মানুষ, বৃক্ষ-লতাগুল্ম, পশুপাশি শান্তিতে থাকুক।

The End

PDF by BDebooks.Com